Friday, April 20, 2012
8:44 AM

অনীক

এপ্রিল ২০১২
বর্ষ ৪৮ ❑ সংখ্যা ১০

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ
'অদৃশ্য হাত' ...❑ ধারা চট্টোপাধ্যায় ❑১২
উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন...হিরণ্ময় ধর ❑ ১৫
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ...❑ সমরেশ মিত্র ❑১৮

এখন পশ্চিমবঙ্গ
'মা-মাটি-মানুষ'-এর গণতন্ত্র❑দীপংকর চক্রবতী❑২
নোনাডাঙ্গা:যাত্রা শুরু .. ❑ দীপ্র চৌধুরী ❑ ৫
মাইনে কেটে কণ্ঠরোধ... ❑ পরিচয় কানুনগো ❑ ১০

শতবর্ষে স্মরণ
আত্মসচেতনতার ভাষা ❑ সন্দীপ মুখোপাধ্যায় ❑৩৯

প্রবন্ধ
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইতিহাস...❑ শুভ্রকেতন বসু ❑ ২০
'পরিবর্তন'-এর আগে ও পরে ❑ পার্থ সারথি ❑ ৩১

পত্রপত্রিকা থেকে
কলকাতা একদিন... ❑ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ❑ ৮

কবিতা
কবিতা পড়া শুরু করার আগে...❑তড়িৎ চৌধুরী ❑১৪

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও
টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
গ্রাহকদের যোগাযোগ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

নন্দীগ্রাম থেকে নোনাডাঙ্গা...

এই রাজ্যের নয়া জমানাতে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল আগেই, এবার নোনাডাঙ্গার ঘটনায় মা-মাটি-মানুষের মুখোশটি সশব্দে সরে গিয়ে আড়ালের আসল মুখটি বেরিয়ে পড়লো। সে মুখটি স্বৈরতন্ত্রের। আসলে এটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা মমতা-অনুরাগী 'পরিবর্তন'-পন্থীরা ছাড়াও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাঁরা পূর্ববর্তী দলীয় স্বৈরতান্ত্রিক জমানার পরিবর্তন চেয়েছিলেন, তাঁরাও অনেকেই জানতেন যে, এই নতুন সরকারও মূলত একই পথে চলবে— কেননা এরাও আসলে নয়া উদারবাদী আর্থিক পন্থারই পথিক, এবং দীর্ঘদিনের কংগ্রেসি স্বৈরতান্ত্রিক সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকারী। তবে এতো দ্রুত যে এই নতুন সরকারের প্রকৃত স্বরূপটি এতো নগ্নভাবে উদঘাটিত হয়ে যাবে, সেটা তাঁরা অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন নি।

আসলে নোনাডাঙ্গার সাথে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ব্যবধান সামান্যই। এখানেও কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থেই 'ইন্ডিয়া'র তথাকথিত 'উন্নয়ন'-এর স্বার্থে 'ভারত'-এর বঞ্চিত ব্যাপক উচ্ছিন্ন মানুষদের স্বার্থ পদদলিত, রাষ্ট্রীয় চণ্ডশক্তির সামনে নারী বা শিশুদেরও নিরাপত্তা নেই, প্রতিবাদের সংবিধান-সম্মত গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ত বিপন্ন। এই প্রক্রিয়াই এখন থেকে চলবে ক্রমশ আরও বেশি বেশি নগ্নভাবে।

তবে একটি ব্যবধান অবশ্য রয়ে গেছে। দু'দশকের মধ্যেই পূর্ববর্তী জমানার দলীয় স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপটি অধিকাংশ মানুষের কাছে উদঘাটিত হতে শুরু করেছিল, এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াই ছিল সেই উপলব্ধিজাত বিদ্রোহেরই বিস্ফোরণ, যার প্রভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশটিও। এই মুহূর্তে মাত্র বছরখানেকের কম সময়ের নয়া শাসনের স্বরূপ ব্যাপক মানুষের কাছে মূলত উদঘাটিত নয়, ফলত গণ-বিস্ফোরণেরও আশু কোনো সম্ভাবনা নেই, সম্ভাবনা নেই নাগরিক সমাজের মূলত হাওয়া-মোরগ বৃহত্তর অংশেরও প্রতিবাদে পথে নামার।

তবে আসল মিলটি কিন্তু রয়েই গেছে— সিপিআই(এম)-এর প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিকল্প যেমন হতে পারে না তৃণমূল বা মূল কংগ্রেস, ঠিক তেমনি এদেরও প্রকৃত বিকল্প নতুন করে হতে পারে না অধঃপতিত সিপিআই(এম)-এর বাহিনী। ফলত আন্দোলনের ইতিবাচক বিকাশের পথে মূল সমস্যাটি রয়েই গেছে, আর সেটি হচ্ছে বিপ্লবী নেতৃত্ব ও বিপ্লবী সংগঠনের, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর নির্ধারক ভূমিকার অনুপস্থিতি। বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী কয়েকটি গোষ্ঠী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় থেকে বা পরবর্তীকালে কিছু সক্রিয়তা দেখালেও, সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা এখনও এরা অর্জন করতে পারে নি। অতীতেও বার বার এরকম পরিস্থিতি এসেছে এবং চলে গেছে, চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতিকে সঠিক নেতৃত্ব ও সঠিক কর্মসূচির অভাবে ঈপ্সিত ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা যায়নি।

তাই ব্যাপক মানুষের প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে হলে যেমন সংসদ-সর্বস্ব হলে চলবে না, ঠিক তেমনি গণআন্দোলনের পথ মূলত ও কার্যত পরিহার করে, হাজার আত্মত্যাগ সত্ত্বেও বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে না। সুনিশ্চিতভাবেই সে লড়াই হবে দীর্ঘায়ত ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সম্পন্ন, জটিল ও নানা রকম বাঁকপূর্ণ সেই লড়াইয়ে সত্যি সত্যিই বিজয় অর্জন করতে হলে অতি অবশ্যই দক্ষিণপন্থা ও মেকি বামপন্থার বিরুদ্ধে সমস্ত সম্ভাব্য শক্তির, এবং সাথে সাথে সিপিআই(এম)-জাতীয় মূলত অধঃপতিত 'বাম' দলগুলির মধ্যেও এখনও-থেকে-যাওয়া বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী কর্মীদেরও, ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালাবার বাস্তবসম্মত ও কার্যকর কর্মসূচি গড়ে তুলতে হবে প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবী ও সংগ্রামী শক্তিগুলিকে। তাদের অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিকতা এবং স্বপ্ন ও সাধ্যের বাস্তব সমন্বয়ের উপরই নির্ভর করছে মেহনতি মানুষের ভবিষ্যৎ।

‘মা-মাটি-মানুষ’-এর গণতন্ত্র

দীপংকর চক্রবর্তী

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে মাত্র এগারো মাস আগে সিপিআই (এম)-এর দলীয় স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ব্যাপক মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন হয়েছিল যে টিএমসি-নিয়ন্ত্রিত ‘মা-মাটি-মানুষ’-এর সরকার, এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তার অভূতপূর্ব অতিগতিশীলতা, বর্ণবহুলতা ও বৈচিত্র্যে যে কোনো মানুষই স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান প্রতিবেদনে আমরা তার একের পর এক অধ্যায়গুলিকে তুলে ধরার একটু চেষ্টা করবো।

‘মা-মাটি-মানুষ’-এর এই সরকারের প্রথম অধ্যায়টি ছিল একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের। নির্বাচনের আগে তারা ঠিক যে যে প্রতিশ্রুতি জরুরিভাবে পালনের অঙ্গীকার করে ব্যাপক মানুষের সমর্থন পেয়েছিল, প্রথমেই তারা সেগুলি নিতান্ত অবজ্ঞাভরে ভঙ্গ করেছে। যেমন, তারা জঙ্গলমহলে শান্তিস্থাপনের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবার বদলে সেখানে সিপিআই(এম)-এর বদলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং যথারীতি চলছে যৌথবাহিনী ও পুলিশের অত্যাচার; ছত্রধর মাহাতো-সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবার বদলে সামান্য কয়েকজন কেএলও বন্দীকে জামিন দিয়েছে এবং এবং তারপরই প্রসঙ্গটি সুবিধেজনকভাবে ‘বিস্মৃত’ হয়েছে; কুখ্যাত ইউএপিএ আইন হটাবার বদলে সেই আইনে যথারীতি রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার অব্যাহত রেখেছে। পূর্বতন জমানার অত্যাচারী প্রশাসক বা পুলিশ অফিসারদের কার্যকলাপ নিয়ে তদন্ত দূরে থাক, সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে, প্রমোশন দিচ্ছে। এই সব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রক্রিয়াটি নিয়ে এই পত্রিকা-সহ বহু পত্রিকাতেই বিস্তৃত চর্চা হয়েছে, তাই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল—এবং এখনও তা চালু রয়েছে—সিপিআই (এম)-এর দলীয় স্বৈরতন্ত্রের ‘অবসান’ ঘটিয়ে গায়ের জোরে নিজেদের তথাকথিত ‘দলহীনতা-মার্কা’ স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। জঙ্গলমহলের কথা আগেই বলেছি, সেখানে সিপিআই(এম)-এর দলীয় ‘হার্মাদবাহিনী’র অনুকরণে তারা তাদের ‘ভৈরব বাহিনী’র পেশী ও অস্ত্রের জোরে সেখানে আধিপত্য চালাচ্ছে। অন্য দিকে, বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কার্যকর করার কাজটা যে সত্যিই ছিল গণতান্ত্রিকতারই প্রসার, গ্রামের ব্যাপক সাধারণ মানুষের তা সামনে যে বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। সাথে সাথে এ কথাও সত্যি যে, সিপিআই (এম) তাদের সাংগঠনিক দলীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এবং ভোটের মাধ্যমে অধিকাংশ পঞ্চায়েত দখলে রেখেই ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে চরম দলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। টিএমসি’র সেই সাংগঠনিক ক্ষমতা নেই, তাই তার বিকল্প হিসেবে এই সরকার সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটিকেই সামগ্রিকভাবে বানচাল করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সরকার পঞ্চায়েতের আর্থিক ক্ষমতা আমলাদের হাতে তুলে দিয়েছে, তুচ্ছ অজুহাতে কয়েকটি জেলা পরিষদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। একইভাবে সিপিআই (এম)-নিয়ন্ত্রিত এসএফআই ছলে-বলে-কৌশলে ভোটে জিতে বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে ও প্রায় ধারাবাহিকভাবে তা বজায় রেখেছে, তারাও অনেক ক্ষেত্রে সরাসারি গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র পর্যন্ত তুলতে দেয় নি— তবে সাধারণত প্রকাশ্যে মারদাঙ্গার পথে না যাবার মতো কৌশলী পথই তারা বেছে নিয়েছে। টিএমসি-র ছাত্রবাহিনী সদ্য ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে, তাই ওসব লোক-দেখানো কৌশলের তোয়াক্কা না করেই কলেজে কলেজে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তবন্যা বইয়ে দিতেও তারা পিছু-পা হচ্ছে না, ফেল-করা ছাত্ররা পাশ করিয়ে দেবার দাবিতে কিংবা সাধারণ ছাত্ররা ‘ফার্স্ট ক্লাস’ পাবার দাবিতে বাহুবলের প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। আর সরকার তো শিক্ষায়তনে রাজনীতির ‘অনুপ্রবেশ’ বন্ধ করার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদের ‘অযোগ্যতা’র মাপকাঠি হিসেবে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ও দণ্ডিত অপরাধীদের একই পংক্তিতে বসিয়ে দিয়েছে। সিপিআই(এম) ঠিক যেভাবে কলেজে কলেজে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বেশির ভাগ তাদের নিজেদের দলীয় বা বশংবদ লোকদের এবং যৎসামান্য ক্ষেত্রে শরিক দলের লোকদের মনোনয়ন দিত, ঠিক একই পদ্ধতিতে বর্তমান সরকার সেই সব পদে তাদের দলীয় (দলহীন!) বিধায়ক ইত্যাদিদের, এবং সামান্য কিছু ক্ষেত্রে তাদের শরিক কংগ্রেস দলের লোকদের বসাচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্পর্কিত আইন পাল্টাতে গিয়ে এমন সব হাস্যকর ও অবাস্তব বিধি ঢোকাচ্ছে যে, শিক্ষার সাথে জড়িত তাদের দলীয় লোকেরাও তা মানতে পারছে না।

প্রশাসনিক ব্যাপারেও এই সরকার সিপিআই(এম)-এর পদাঙ্ক সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করছে— সরকার ও দলের পার্থক্য একেবারেই রাখছে না। কোনো ঘটনা ঘটলেই সর্বজ্ঞা ও সর্বশক্তিমতী মুখ্যমন্ত্রী কোনো অনুসন্ধান বা তদন্তের তোয়াক্কা না রেখেই কোন্‌টি ‘সাজানো’ ও কোন্‌টি ত নয়, সে-সম্পর্কে তাঁর

বিশেষজ্ঞ মতামত জানিয়ে দিচ্ছেন, কোনো দক্ষ ও নিরপেক্ষ অফিসার তদন্ত করে তাঁর সেই বক্তব্য ভুল বলে প্রমাণ করলেই রোষানলে পড়ছেন। ফলত, দময়ন্তী সেনরা তৃণমূল জমানার 'নজরুল ইসলাম'-এ পরিণত হচ্ছেন। দিনের পর দিন প্রকাশ্য সভায় মুখ্যমন্ত্রী যে সব কাজে ইতিমধ্যেই সফল হয়েছেন বলে সোল্লাসে দাবি করছেন, নিরপেক্ষ তদন্তে তার অধিকাংশই অসত্য বা অর্ধসত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। বস্তুত তাঁর কথিত সেই সব সাফল্যের যোগফলে পশ্চিমবঙ্গের ইতিমধ্যেই সুজলা সুফলা ও প্রায় বেকার-হীন হয়ে যাবার কথা— যদিও বেরসিক বাস্তব তার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষকদের প্রতি মানুষের সহানুভূতিকে পুঁজি করে মমতা সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছেন, কিন্তু 'বাম' জমানায় তাদের বিরুদ্ধে রুজু-করা মিথ্যে মামলাগুলি এখনও প্রত্যাহৃত হয় নি, উপরন্তু নোনাডাঙ্গার মতো ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে, এবং 'বাম' সরকারের মতোই কর্পোরেটদের স্বার্থে গরীবদের উৎখাত করে, বুলডোজার দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথ ধরলেও পুলিশের লাঠি নেমে আসছে, মিছিল বা অবস্থানের গণতান্ত্রিক অধিকারও রাষ্ট্রীয় বা দলীয় হিংসা দিয়ে প্রতিহত করা হচ্ছে, 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। পার্লামেন্টে প্রধান শাসক দল কংগ্রেসের সাথে দর-কষাকষির স্বার্থে রাজ্য সরকার মাঝেসাঝে নয়া-উদারনৈতিক আর্থিক নীতির 'বিরোধী' হিসেবে ভান করছেন, কিন্তু রাজ্যে বহাল তবিয়তে প্রায়-অনুসরণযোগ্য মডেল হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রে তুলে ধরা হচ্ছে সেই নীতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রাইভেট-পাবলিক-পার্টনারশিপ মডেলটিকে।

সিপিআই(এম)-এর পদাঙ্ক সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করার আর একটি 'উজ্জ্বল' দৃষ্টান্ত দিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করবো। সিপিআই(এম) যেমন ক্ষমতাসীন হবার পর নানা 'কৌশলে' বহু কট্টর বাম-বিরোধী বা 'নিরপেক্ষ' লোককেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল, টিএমসি-ও ঠিক একই পথ অনুসরণ করছে ও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই সফল হয়েছে। এই রাজ্যের নাগরিক সমাজের বিপুলসংখ্যক প্রতিবাদী মানুষের যে অভূতপর্ব সমাবেশ ঘটেছিল 'বাম' স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তাঁদের অনেকেই এখন চোখের সামনে সেই স্বৈরতন্ত্রেরই নিত্যনতুন প্রকাশ সত্ত্বেও 'গর্তে' ঢুকে গেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার-কর্মী— সব রকমের মানুষই, এঁদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু মাত্র এক বছর আগেও এসবের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন। কেউ কেউ সুবিধেজনক নীরবতার আঁচলের আড়ালে মুখ ঢেকেছেন নতুন সরকারের কাছ থেকে নানা রকম উপঢৌকন, অর্থ, পদ, সম্মান ইত্যাদি পেয়ে; কেউ কেউ পাবার আশায়; কেউ কেউ আবার সরকারের বিরোধিতা করে কোনো ঝামেলায় যাতে না পড়তে হয় সেজন্য। সাধেই কি আর বুর্জোয়া সমাজের প্রধান অংশটিকে গ্রামশ্চি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবাদাস ও রক্ষাকবচ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন!

এবার আমরা আসবো আমাদের আলোচনার তৃতীয় অধ্যায়ে, যেখানে বর্তমান সরকার স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার ক্ষেত্রে পূর্বতন সিপিআই(এম) শাসনকেও ছাড়িয়ে যাবার কৃতিত্ব দেখাতে শুরু করেছে। এর সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে অতি সম্প্রতি পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে সরকারের অনুসৃত দু'টি প্রত্যক্ষ, এবং তার আড়ালের পরোক্ষ, পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে। এই রাজ্যে যে সব পাঠাগার সরকারি অনুদান পায়, পূর্ববর্তী জমানায় সেগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কমিটিগুলির কর্তৃত্বে ছিল সিপিআই(এম)-সমর্থকরা। ফলত সেগুলিতে তাদেরই 'গণতান্ত্রিক' নিয়ন্ত্রণে ছিল, এবং সেগুলিতে সিপিআই(এম)-মুখপত্র *গণশক্তি* নেওয়া কার্যত বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু যেগুলি তাদের কর্তৃত্বে ছিল না, সেখানে কোন্ পত্রিকা নেওয়া হবে, তা নিয়ে সরকারিভাবে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাতাবরণ সৃষ্টির মতো সাংগঠনিক শক্তি নেই, ফলত সেই পদ্ধতিতে তাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তাই তারা সোজাসুজি মুগুর হাতে নেমে পড়েছে, যাতে পাঠাগারগুলিতে তাদের বিরোধী বক্তব্যবিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলি ঢুকতে না পারে। কোন্ কোন্ সংবাদপত্র পাঠাগারগুলি রাখতে পারে, সে সম্পর্কে জারি হয়েছে সরকারি ফতোয়া। স্বভাবতই এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা উঠেছে। পরে যেজন্য সরকার বাধ্য হয়েছে সেই তালিকাটিকে একটু প্রসারিত করতে, এবং অন্তত লোক-দেখানোর জন্য একটি সিপিআই(এম)-পন্থী সংবাদপত্রকেও সেই তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। পাঠাগারগুলির পাঠক বা সদস্যদের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার কেড়ে নেবার এতোটা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা কিন্তু সিপিআই(এম)-শাসনেও দেখা যায় নি। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রত্যক্ষ এই অগণতান্ত্রিক ফতোয়ার আড়ালের আরো স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এই ফতোয়া নিয়ে বিতর্ক গড়ে ওঠার দু'-একদিন পরেই তিনি তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ এক টিভি-চ্যানেলে খোলাখুলিভাবে বলেছেন: 'তবুও *তো ঠিক কোন্ কোন্ সংবাদপত্র পড়া যাবে, সেটা এখনও বলি নি... তবেও সেটাও ভবিষ্যতে সম্ভবত বলতে হবে।*' এ-সম্পর্কে সামান্য কয়েকজন বাদে গণতন্ত্রের দাবিতে সোচ্চার অধিকাংশ 'পরিবর্তনপন্থী' কিন্তু মুখ খোলেন নি!

দ্বিতীয় ফতোয়াটি, শেষ বিচারে, আরও বেশি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন। তথ্য দপ্তর থেকে এক সার্কুলার দিয়ে নির্দেশ জারি করা হয়েছে: এবার থেকে জেলা থেকে কোনো পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না। জেলা থেকে মূলত এতোদিন বিজ্ঞাপন পেতো. কিছু ছোটো ও মাঝারি পত্রিকা এবং লিটল

ম্যাগাজিন—যাদের অধিকাংশের পক্ষে কিছু সরকারি বিজ্ঞাপন ছাড়া খরচ তোলা খুবই কষ্টকর। তার মানে কি এই যে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এইধরণের পত্রিকাগুলি বর্তমান আমলে বিজ্ঞাপন পাচ্ছে? অন্তত সার্কুলারটি থেকে এরকম একটি ধারণা হতেই পারে। কিন্তু বাস্তব তথ্য হচ্ছে, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কলকাতার এই সব পত্রিকাগুলিও কোনো সরকারি বিজ্ঞাপন পায় নি। কারণ এতোদিন প্রতি আর্থিক বছরের শুরুতেই এই সব পত্রিকার কাছ থেকে বিজ্ঞাপনের আবেদন নেওয়া হতো এবং সরকারি বিধি অনুসারে যাদের প্রাপ্য তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো । গত বছর নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় বামফ্রন্ট আমলে সেই প্রক্রিয়া শুরুই হতে পারে নি। মে মাসে ক্ষমতায় বসে বর্তমান সরকারও সেই প্রক্রিয়া কার্যকর করে নি। ফলত ছোটো সংবাদপত্র ও লিটল ম্যাগাজিনগুলি রাইটার্স থেকে বিজ্ঞাপন পায় নি। সেই বাবদ বরাদ্দ টাকা কোন্ খাতে কী বাবদ খরচ হলো, সেটাও জানতে পারি নি।

প্রাসঙ্গিক কিছু পূর্ব কথা বললে আলোচনার সুবিধে হবে। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন বিধি প্রথম সুসংগঠিত হয় পূর্ববর্তী জমানাতে, ১৯৮১ থেকে। তার আগে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রাসঙ্গিক বিধি ছিল না। যে কারণে সত্তরের দশকে এই রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী প্রকাশ্যে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন : যে সব পত্রিকা তাদের সরকারকে সমর্থন করবে না, তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না। বামফ্রন্ট আমলেও প্রথমে দলীয় রং দেখেই মূলত বিজ্ঞাপন দেবার প্রথা চালু ছিল। কিন্তু বামফ্রন্টই ১৯৭৯ সালে রাজ্যের ছোটো ও মাঝারি পত্রিকাগুলির তথ্য-সংগ্রহ করার জন্য সাংসদ শশাংকশেখর সান্যালকে চেয়ারম্যান করে একটি 'Fact-finding Committee' গঠন করে, কমিটি অসম্ভব পরিশ্রম করে জেলায় জেলায় ঘুরে রিপোর্ট তৈরি করে ১৯৮০-তে সেটা পেশ করে। এই সব পত্রিকার অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নতির জন্য কমিটি ৪৪টি সুপারিশ করে। ১৯৮১-র ১৪ জুলাই রাজ্য ক্যাবিনেটের

বৈঠকে সেই রিপোর্ট পেশ করা হয়, এবং সেগুলির মধ্যে ১১টি সুপারিশ ক্যাবিনেট গ্রহণ করে [Memo No.: 3140(16), dtd.29.03.1982, of the Department of Information & Cultural Affairs, Government of West Bengal]। তার মধ্যে ৫ বা ৬টি সিদ্ধান্ত কার্যকরও হয়েছিল। সুপারিশের ২ ও ৩ নং সুপারিশ অনুসারে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: এই রাজ্যে নিয়মিত প্রকাশিত, অন্তত ৫০০ কপি বিক্রি আছে এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে না —এমন সব পত্রিকাকে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। তাছাড়া ২৮ নং সুপারিশের ভিত্তিতে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: জেলার পত্রিকাগুলিকে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের মাধ্যমে জেলা থেকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। বামফ্রন্ট সরকার পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম স্বৈরতান্ত্রিকতার পরিচয় দিলেও, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সব মিলিয়ে ২৬ বছর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অন্তত এই ক্ষেত্রে সরকার এই সিদ্ধান্তগুলিকে জারি রেখেছিল। ফলত বর্তমান সরকার এ বিষয়ে যে পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা পূর্ববর্তী সরকারের অবস্থান থেকে একেবারেই আলাদা। জেলাগুলি থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া তো বন্ধ রাখা হয়েইছে, এমনকি রাইটার্স বিল্ডিংস্ থেকে কলকাতার যে সব ছোটো পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন বিজ্ঞাপন পেতো, এবছর তাদের তালিকা পর্যন্ত তৈরি হয় নি। দপ্তর থেকে ফাইল তৈরি করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের) কাছে পাঠানো হয়েছিল, তিনি তা ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া এখান থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়াও বন্ধ আছে।

কেন আমি এই পদক্ষেপটিকে 'আরও বেশি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন' বলে অভিহিত করছি? বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সবাই-ই স্বীকার করবেন যে, সাম্প্রতিক কালে বাংলা সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ২০০৬ থেকে এই রাজ্যে গণ-আন্দোলনের ব্যাপকতা বাড়িয়ে তোলার পিছনে এগুলির বিশেষ ভূমিকার কথা সর্বজনস্বীকৃত। তাছাড়া ছোটো সংবাদপত্রগুলিও বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আসছে সেই *কাঙাল হরিনাথের* সময় থেকে মফঃস্বল বাংলার প্রকৃত ছবি এবং গরীব মানুষদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরার ব্যাপারে। যে কারণে অনেকের মতে, এদের ভূমিকা অনেকটা প্রদীপের আলোর মতো; বৃহৎ সংবাদপত্রের উজ্জ্বল ঝক্ঝকে আলো যে-সব আনাচে-কানাচে ঢুকতেই পারে না, সেখানেই আলো দেখায় এই ছোটো সংবাদপত্রগুলি। ফলত, এইসব ছোটো সংবাদপত্র ও লিটল ম্যাগাজিনগুলির কণ্ঠরোধ করা, কিংবা তাদেরকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সরকারি তাঁবেদারি করতে বাধ্য করাটা যে কোনো স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতাবিশিষ্ট শক্তির পক্ষেই বিশেষ জরুরি। সবারই একথা জানা আছে যে, প্রথম জীবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত রাজনৈতির 'গুরু' ছিলেন বর্তমানে তাঁর মন্ত্রীসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের অন্যতম সুব্রত মুখোপাধ্যায়, যিনি, আগেই বলেছি, সত্তরের দশকের প্রথম দিকেই সরকার-বিরোধীদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করে নিজের 'গণতন্ত্রপ্রিয়তার' প্রমাণ রেখেছিলেন, এবং . ১৯৭৫-৭৭-এর সেই কুখ্যাত জরুরি অবস্থার সময় এই রাজ্যে সংবাদপত্র সেন্সার করার ব্যাপারে বিশেষ 'দক্ষতা' দেখিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক শিষ্যা তাঁর সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করলে অবাক হবার কোনো কারণ স্বভাবতই থাকবে না। এই মন্তব্যের সাথে সম্প্রতি একটি সংবাদপত্র উদ্বোধন করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধায়ের সবিস্ময় প্রশ্নটিকে মিলিয়ে নিন (/এখনই

সংবাদপত্র সেন্সারশিপের এসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে—তাহলে পরে তাঁরা কী বলবেন!)। এই 'পরে'-কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য কি আমরা সত্যিই বুঝতে পারছি!

কাজেই এই সব ব্যাপারে নিঃসন্দেহে বর্তমান সরকার সিপিআই(এম)-স্বৈরতন্ত্রকেও অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রকৃত তথ্য বিকৃতভাবে পরিবেশনের লক্ষ্যে সিপিআই(এম)-এর সমস্ত প্রচেষ্টাই যে ব্যর্থ হয়েছিল, তার প্রধান কারণই ছিল এই যে, অনেক সংবাদপত্র, বিশেষত টিভি চ্যানেল তখন প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরেছিল। এই মুহূর্তে এই রাজ্যে কেবলমাত্র বিরোধী সিপিআই(এম)-অনুসারী সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল ছাড়া (স্বাভাবিকভাবেই!) সমস্ত বড়ো সংবাদ-মাধ্যমই বাস্তবত সরকারের হাজার অন্যায় ও সন্ত্রাস এবং স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা সত্বেও তার বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ তো করছেই না, বরং নির্লজ্জের মতো প্রকৃত তথ্যকেও বিকৃতভাবে পরিবেশন করছে। তার সঙ্গে যোগ করুন সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে নাগরিক সমাজের অধিকাংশ স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী ও গণতন্ত্রপ্রিয় 'পরিবর্তন-পন্থীদের' লজ্জাজনক আত্মবিক্রয়ের ও বিবেক-বন্ধক দেবার ঘটনাটিকে। এখানেই মমতাময়ী তথা তৃণমূলী স্বৈরতন্ত্র সিপিআই (এম)-স্বৈরতন্ত্রকে হাজার গোলে হারিয়ে দিয়েছে! মমতা-র ভাষাতেই বলতে হচ্ছে : এখনই এই অবস্থা, 'এর পরে' কী হবে!

নোনাডাঙ্গা : যাত্রা শুরু হলো এবার!

দীপ্র চৌধুরী

অবশেষে নোনাডাঙ্গায় ছিন্নমূল মানুষগুলির উপর পুলিশি হিংস্রতা এবং তাদের ও তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো মানুষগুলির উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নগ্ন আক্রমণের মধ্যে দিয়ে মা-মাটি-মানুষের সরকার তার প্রকৃত রূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

নোনাডাঙ্গা জায়গাটার অবস্থিতি কলকাতার ই এম বাইপাসের রুবি হাসপাতাল মোড়ের খুব কাছেই, যার ক্রমবর্ধমান মূল্যের জমির দিকে কর্পোরেট সেক্টর, সরকারি মদৎপুষ্ট প্রমোটার ও রিয়াল এস্টেট জমি-হাঙরদের দৃষ্টি বহু দিনের। এখানকার বস্তিতেই বাস করেন কলকাতার 'উন্নয়ন' প্রক্রিয়ার শিকার শহরের বিভিন্ন ক্যানালের পাশে বহুদিন ধরে বসবাসকারী উচ্ছিন্ন মানুষেরা—সরকারি ভাষায় যারা 'জবরদখলকারী'! বিভিন্ন সামাজিক উৎস থেকে এখানে এসে জোটা বিভিন্ন পরিচয়ের মানুষগুলির কিন্তু একটি বিষয়ে ভীষণ মিল—দারিদ্র্যের এবং কার্যত নিঃস্বতার ও অসহায়তার বিচারে।পূর্বোক্ত একদা-ক্যানাল-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির বাসিন্দা ছাড়াও সুন্দরবনের আয়লার ভয়াবহতার শিকার হতভাগ্য মানুষেরা, এমনকি পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার নন্দীগ্রামের কিছু মানুষও। সব মিলিয়ে সেখানে থাকেন প্রায় ৩০০ পরিবার।

এই প্রেক্ষিতেই একবার স্মরণ করে নেওয়া দরকার বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় আরোহণের পটভূমিকাটি। এই শতকের প্রথম থেকেই প্রায় আড়াই দশকের বামফ্রন্ট শাসনে তার প্রধান শক্তি সিপিআই(এম)-এর স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা যখন ক্রমশ নগ্ন হয়ে পড়ছিল, মানুষের বিক্ষোভ বাড়ছিল, কিন্তু নির্ভরযোগ্য বিকল্প শক্তির অনুপস্থিতিতে তা প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ২০০৬-এ সদ্য-ভোটে জিতে ক্ষমতাগর্বী সেই সরকার প্রথম প্রকৃত অর্থে প্রথম কার্যকর গণপ্রতিরোধের মুখে পড়েছিল সিঙ্গুরে, তার পর মাত্র এক বছরের মধ্যে নন্দীগ্রামে। উল্লেখ্য যে, কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে ব্যাপক মানুষকে বিপন্ন করে তোলার নয়া উদারবাদী সেই সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সেই ঐতিহাসিক লড়াই মূলত কোনো দলের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় নি, বরং হয়েছিল ব্যাপক মানুষের স্বতঃস্ফুর্তভাবে সংগঠিত গণপ্রতিরোধের ফলশ্রুতিতে। সে সময় সিপিআই(এম)-এর রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাসের পরিণতিতে তাদের পায়ের তলা থেকে যে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে, সেটা উপলব্ধি করে দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুযোগ বুঝে সেই লড়াইয়ের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রাজ্যের নাগরিক সমাজের প্রধান অংশটিও নিজেদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে পথে নেমেছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াইয়ের সমর্থনে। সেই লড়াই ও নাগরিক সমাজের সমর্থনের ফসলটি অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে আত্মসাৎ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং উল্লেখযোগ্য কার্যকর বিকল্প শক্তির অনুপস্থিতিতে তিনি শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন তাঁর মূল লক্ষ্যে পৌঁছোতে—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মসনদ দখল করতে। অর্থাৎ এক কথায়, মমতা সরকার ক্ষমতাতেই এসেছিল সিপিআই (এম)-এর দলীয় স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ব্যাপক মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, ব্যাপক মানুষকে উৎখাত না করার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে। প্রথম থেকেই তাঁর সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি থেকে ক্রমশ সরে আসার সুস্পষ্ট প্রবণতা ধরা পড়ছিল। নোনাডাঙ্গার মধ্যে দিয়ে সেই প্রবণতাই যে তাঁর আসল রূপ, তা প্রমাণিত হলো। আমাদের দেশে কংগ্রেস, বিজেপি বা রাজ্য-ভিত্তিক দলগুলি এবং অধঃপতিত বামপন্থী শাসনে 'উন্নয়ন' কথাটির বাস্তব অর্থ হচ্ছে উচ্ছেদ —এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে নির্মম বাস্তব। দেশের মুষ্টিমেয়, ১৫ থেকে ২০ শতাংশ

মানুষ, যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ইন্ডিয়া', তার উন্নয়নের স্বার্থে ক্রমশ বিপন্ন হয়ে উঠছে বাকি ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ মানুষের দেশ 'ভারত'-এর ব্যাপক মানুষের অস্তিত্ব, জীবন ও জীবিকা। মমতা আসলে যে গণবিরোধী কংগ্রেসি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন, স্বাভাবিকভাবে তিনিও, ভোটে জেতার জন্য যা-ই করুন বা বলুন, শেষ বিচারে, সেই 'উন্নয়ন'-এর মডেলেরই পথিক। তাঁর সেই প্রকৃত সত্তার স্বরূপই উদঘাটিত হলো নোনাডাঙ্গার ঘটনার মধ্যে দিয়ে। কর্পোরেট-পুঁজির স্বার্থে এবার থেকে এভাবেই ক্রমশ ব্যাপক গরীব মানুষদের বিপন্ন করে চলবে মমতা'র মা-মাটি-মানুষ-এর সরকার।

নোনাডাঙ্গার মানুষদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। সেখানে বসবাসকারী কিছু মানুষদের জন্য (সবার নয়) শুওরদেরও থাকার অযোগ্য কিছু বিকল্প ব্যবস্থা সেখানকার মানুষদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সরকারি মদতে কেএমডিএ তোড়জোড় শুরু করেছিল সমস্ত মানুষকে নানা অজুহাতে উৎখাত করার। সেই প্রেক্ষিতে গত ১লা মার্চ সেখানকার মানুষেরা মুখ্যমন্ত্রীকে মর্মান্তিক ভাষায় একটি চিঠি দিয়ে তাদের বাস্তব করুণ অবস্থাটা একবার দেখে যাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন: দিদি যদি তাপসী মালিককে (সিঙ্গুরের) দেখবার জন্য বার বার সেখানে ছুটে যেতে পারেন, তাহলে অন্তত একবার কি পারেন না তাদের ৮০০ মানুষের অবস্থা দেখে যেতে। দিদি সেই অনুরোধে সাড়া দিতে পারেন নি, কারণ এ দিদি সে দিদি নন—সে দিদির সামনে ছিল গদি দখলের হাতছানি, এ দিদি ইতিমধ্যেই সেই গদি দখল করে নিয়েছেন, তাই সেই মাত্র ৮০০ মানুষের স্বার্থের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই তাঁর কাছে!

মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী
মহাশয়,
আমরা প্রায় দেড়শত ঘর ফ্যামিলী পরিবার বেশ্টিত নোনাডাঙ্গা খাস জমিতে বসবাস করিতেছি, কেউ দু বৎসর যাবত, কেউ ৬ মাস উত্তর পাশে আরও একটা কলোনী সেটাও প্রায় একশত ঘর যার গড় লোক সংখ্যা আনুমানিক ৭।৮ শত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে বসবাস করছি। বিগত ৩৪ বৎসর যাবৎ আমরা বঞ্চনার শিকার। খাল পাড়-খাস জমিতে বসবাস করিতাম দুর্মূল্যের বাজারে আমরা গরীব মুটে মজুরের কাজ করিয়া শেষ সম্বল দিয়ে ঘর করে বসবাস করছি। এখন আমাদের আবার উচ্ছেদ করা হবে, কোথায় যাবো আমরা মহানুভব আপনি দেখেছি আপনার কর্মপন্থা, একটা তাপসী মালিকের জন্য যদি একটা সরকার পরিবর্তন হয়, তাহলে ৭।৮ শত মানুষের উচ্ছেদ আপনি কি ভাবে করবেন। যখন একটা বা দুটো ঘর হয়ে ছিল তখন যদি বাধা পেতাম এত আঘাত পেতাম না। বিগত পঞ্চাশ-ষাট বৎসর যে জমির প্রয়োজন হয়নি আজ আমরা বসবাস করছি, এখন প্রয়োজন হয়েছে সরকারেরা বুঝতে পারছেন।
সহায় সম্বলহীন গরীব শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। তাই ৭।৮ শত গরীবের শেষ আবেদন একটি বার যদি নিজের চোখে দেখেন যদি মনে করেন আমরা ৭।৮ শত লোক উচ্ছেদ হবে দুঃখ পাব না শুধু একটি বার এসে দেখে আমাদের দৈনন্দিন জীবন— জানি একটা তাপসী মালিকের যদি দিদি ছুটে যেতে পারেন তাহলে ৮ শত মানুষের ডাকে একবার দিদিকে দেখতে পাবো এই আশা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম।
প্রণামান্তে—
নোনাডাঙ্গা মজদুর পল্লী, থানা তিলজলা, দঃ ২৪ পরগণা
তারিখ: ১০.০৩.২০১২ *বানান ও বাক্য গঠন অপরিবর্তিত*

তার প্রমাণই মিলেছিল গত ৩০ মার্চ, যখন সকাল দশটা নাগাদ কেএমডিএ-র লোকেরা তিনটে বুলডজার এবং বিপুল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছিল নোনাডাঙ্গায়—তবে সঙ্গে তিনটে ফায়ার ইঞ্জিন রেখে তারা মহানুভবতার ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে কার্পণ্য করে নি। আগে থেকে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রয়োজনীয়ত্র কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনুভবই করে নি, শুধু ২৮ মার্চ একটা নাম-কে-ওয়াস্তে মাইক-প্রচারে অধিবাসীদের ১২ ঘন্টার মধ্যে সেখান থেকে চলে যাবার নির্দেশঘোষণা করা হয়েছিল। ৩০ মার্চ সেখানকার ব্যাপক মানুষের হাজার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে সেই পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঝুপড়িগুলির উপর, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই শত শত মানুষকে প্রথমে প্রচণ্ড রোদ ও পরে ঝড়বৃষ্টির সামনে অসহায় করে তুলেছিল। খবর পেয়ে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নানা গোষ্ঠী, মত ও পথের সামাজিক কর্মীরা।

৪ এপ্রিল সবাই মিলে সেখানে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন হতভাগ্য মানুষগুলির পুনর্বাসনের দাবিতে। বামফ্রন্ট জমানার 'অত্যাচারী' পুলিশ যে মমতা সরকারের যাদুকাঠির ছোঁয়াতেও তার স্বাভাবিক চরিত্র আদৌ পাল্টায় নি, তার প্রমাণ মিলেছিল। লাঠি হাতে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শান্তিপূর্ণ সেই প্রতিবাদ ভেঙে দেবার জন্য। শিশু, নারী, এমনকি গর্ভবতী নারীরাও কেউই রেহাই পায় নি সেই চণ্ডশক্তির আক্রমণ থেকে। এমনকি সেখানকার দলীয় কর্মীদের মতো এখানেও সেদিন পুলিশের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লাঠি চালাচ্ছিল কিছু দলীয় ভৈরব বাহিনীর মাস্তান বাহিনীর লোকেরা। ঠিক যেন নন্দীগ্রামের টি ভি'র পর্দায় দেখা ছবিরই কার্বন কপি! পুলিশ ও তার সঙ্গীরা লুঠপাট করে দখল নিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের যৎসামান্য সমস্ত সম্পত্তির। পরে জানা গিয়েছিল, পুলিশের লাঠিতে মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেই গর্ভবতী নারীটির নাম রীতা পাত্র—এবং চমকে যাবেন না, তিনি ও তাঁর স্বামী সুরজিৎ পাত্র সেখানে এসে ঘর বেঁধেছিলেন নন্দীগ্রাম (বংশীগৌরী, দেবীপুর) থেকে! হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল আরেকজন মহিলাও, নাম রিনকি দাস, বয়স একুশ, পুলিশ তাঁর অভিযোগ পর্যন্ত নিতে অস্বীকার করেছিল, যদিও তাঁকে চিকিৎসা করেছিলেন যে ডাক্তার শুভ্রজিৎ রায়, তিনি তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্টে পুলিশের লাঠির

আঘাতে তাঁর ক্ষত সম্পর্কে পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এর পর ৮ এপ্রিল নোনাডাঙ্গার স্থানীয় উচ্ছিন্ন মানুষেরা, নারী-শিশু-সহ, এবং উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির (বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা গঠিত) কর্মীরা রুবি হাসপাতালের মোড়ে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং উচ্ছিন্ন মানুষদের পুনর্বাসনের দাবিতে প্রতিবাদী অবস্থানে বসেছিলেন পুলিশকে জানিয়েও। তা সত্বেও তাঁদের ৬৯ জনকে পুলিশ এসে জোর করে ধরে নিয়ে যায় লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে । তাঁদের মধ্যে ছিল ৯ বছরের এক শিশুও, নাম মণিকাকুমারী শাউ, বাবার নাম দিলীপ শাউ। সিঙ্গুরের প্রথম পুলিশি আক্রমণের সময় (২০০৬-এর সেপ্টেম্বরে) তার গ্রেপ্তার হওয়া মায়ের সঙ্গে শিশু পায়েলের কথা মমতা'র মনে রাখার কথা নয়, যদিও সেদিন তিনি উপস্থিত ছিলেন, এবং পরে নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলির সাথে তিনিও এই "শিশু-গ্রেপ্তারের" ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন! পরে রাত ন'টা নাগাদ পুলিশ সেই ৬৯ জনের মধ্যে ৬২ জনকে ছেড়ে দিলেও, ৭জন কর্মীকে (পার্থসারথি রায়, শমীক সরকার, সিদ্ধার্থ গুপ্ত, দেবলীনা চক্রবর্তী, অভিজ্ঞান সরকার, দেবযানী ঘোষ ও মানস চ্যাটার্জী) নানা কঠোর আইনে (স্বভাবতই মিথ্যে অভিযোগে) গ্রেপ্তার করে রাখে। সরকার ও পুলিশের মিথ্যের বেসাতির ধারাবাহিকতা অবশ্য তাতে রক্ষিতই হয়, কারণ প্রথম থেকেই তারা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সমগ্র আন্দোলনটিকে (ঠিক সিপিআইএম-এর পদাংক অনুসরণ করে!) মাওবাদীদের কর্মকাণ্ড বলে গল্প ছড়িয়ে চলেছে। ১০ তারিখে কর্মীদের আদালতে তোলা হলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়াই, এমনকি এফআইআর-এ উল্লেখ না করলেও, অস্ত্রশস্ত্র রাখা-সহ আজগুবি সব অভিযোগ তোলে এবং তাঁদের ১৪ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে রাখার আবেদন জানায়। তরুণ বিজ্ঞানী পার্থসারথি রায় যে ঘটনার সময় তাঁর কর্মসূত্রে কল্যাণীতে ছিলেন, তার প্রমাণ হাজির করা হয়। তবুও, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই আদালত তাঁদের ৭ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য যে সাজানো মামলায় তাঁর অন্যায় গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বৈজ্ঞানিকরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

১১ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে দুপুরে কলেজ স্কয়ার থেকে প্রতিবাদী মিছিল বের করার কর্মসূচি নেওয়া হয়। শুরুতেই বিরাট পুলিশবাহিনী এসে ৬৬ জনকে (৪০ জন পুরুষ ও ২৬ জন মহিলা) এবং ৪জন শিশুকে লালবাজারে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ততোক্ষণ কলেজ স্কয়ারে বক্তৃতা, স্লোগান, পোস্টারিম ইত্যাদি চলতে থাকে। আসলে পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ মিছিল করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া।

সংবিধান-সম্মত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সিপিআই(এম) জমানার মতো, কিংবা তার চেয়েও বেশি আক্রমণ আগামী দিনে এভাবে যে নেমে আসবেই - নোনাডাঙ্গার ঘটনা ও আন্দোলনে সরকারি পদক্ষেপগুলি তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহণ করছে। নোনাডাঙ্গা থেকে সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের প্রকৃত দূরত্ব শেষ পর্যন্ত যে আর একেবারেই বজায় থাকবে না তা অচিরেই তার আরও বেশি প্রমাণ অবশ্যই মিলতে শুরু করবে।

মাত্র দু'মাস আগে এক প্রেস-সম্মেলনে গত কয়েক বছরের স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী ব্যাপক গণআন্দোলনের বিবেক হিসেবে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অভিহিত মহাশ্বেতা দেবী যখন প্রশ্ন তুলেছিলেন : এই ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপই কি আমরা চেয়েছিলাম, তখন নাগরিক সমাজের প্রায় সমস্ত 'পরিবর্তনপন্থীরাই' কার্যত তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছিলেন। আজ তাঁর সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে বহু মানুষের মনে। এর পরও যাঁরা মুখ ফিরিয়ে থাকবেন নির্মম বাস্তবতার দিকে, ভবিষ্যৎ ইতিহাস কিন্তু তাঁদের ক্ষমা করবে না!

গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরে পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে—

নোনাডাঙ্গার উচ্ছেদের ঘটনায় গতকালের (৮ এপ্রিল, ২০১২) শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও আজকের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশি আক্রমণ গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরেই আক্রমণ। এই ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত এবং এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। অবিলম্বে ধৃতদের মুক্তির দাবিও করছি।

মহাশ্বেতা দেবী অশোক মিত্র শঙ্খ ঘোষ সুনন্দ সান্যাল কৌশিক সেন কবীর সুমন তরুণ সান্যাল নবারুণ ভট্টাচার্য দীপংকর চক্রবর্তী প্রতুল মুখোপাধ্যায় মেহের ইঞ্জিনিয়ার সব্যসাচী দেব অসীম চ্যাটার্জী বোলান গঙ্গোপাধ্যায় রতন খাসনবিশ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু দাশগুপ্ত নব দত্ত দিলীপ চক্রবর্তী আশিস লাহিড়ী মীরাতুন নাহার দেবব্রত পণ্ডা বিপুল চক্রবর্তী সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী অমিতদ্যুতি কুমার দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী সলিল বিশ্বাস নীলাঞ্জন দত্ত গৌতম সেন কুমার রানা সুমিত চৌধুরী শাশ্বতী ঘোষ অমিত ভট্টাচার্য সুজাত ভদ্র ছোটন দাস চন্দনা মিত্র প্রণব দে অভিজিৎ সেনগুপ্ত পার্থ সেন রণেশ রায় শুভাশিস মুখোপাধ্যায় তাপস চক্রবর্তী অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রেমাংশু দাশগুপ্ত অচিন্ত্য সুরাল অর্জুন সেনগুপ্ত দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রফুল্ল চক্রবর্তী রঞ্জিত সুর কল্লোল ভট্টাচার্য সাথী মুখার্জী সুকান্ত দাস কৌশিক গাঙ্গুলী সুমনা মুখার্জী শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় অভীক মুখার্জী অমিত রায়চৌধুরী

পত্রপত্রিকা থেকে

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী লন্ডন হবে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কাল ভোরের দিকে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এল। সেই সঙ্গে ঝড়। খুব ছেলেবেলা, মনে আছে রাজুর, এইরকম বৃষ্টি হলে গুটিসুটি মেরে কাঁথার ভিতর শুয়ে থাকত। দরমার ঘরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে জলের ছাঁট এসে সে কাঁথা কখনও-সখনও ভিজিয়েও দিত। তবু, একটা অদ্ভুত ভালোলাগা ছিল সেই ভোরের বৃষ্টিতে। হোক না দরমার ঘর, তবু ঘর তো একটা ছিলই। কাল ভোরের দিকে যখন ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এল, তখন রাজুর মাথার ওপর শুধুই খোলা আকাশ। গায়ে দেওয়ার কাঁথাকানি, বা দরমার বেড়া ঘেরা সেই ছোট্ট এতটুকু ঘুপচি ঘর— রাজুর সম্বল বলতেআর কিছুই নেই এখন। ফলে, ভোরের ঝাঁপানো বৃষ্টিতে রাজুকে ভিজেতে হলো। ভিজতে ভিজতে কাঁপুনিও ধরল একসময়। নাভির ভিতর থেকে সে কাঁপুনি উঠে এল সারা শরীর বেয়ে। এইরকম সময়, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কাকে অভিসম্পাত করতে হয়— তাও জানে না রাজু। সেই ভোরের বৃষ্টিতে, সর্বাঙ্গ যখন ভিজে যাচ্ছে, এক অসহ্য কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে, রাজু তখন চোখের জলে অভিসম্পাত করছিল ঈশ্বরকেই।

রাজুকে আপনি চেনেন? আপনি? আপনি? বা, আপনি? আপনারা কেউই রাজুকে চেনেন না, চেনার কথাও নয়। ওর পুরো নাম রাজু হালদার। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা এবার। আর বোধহয় পরীক্ষা দেওয়া হবে না। রাজুরা নোনাডাঙায় থাকে। এখন আর থাকে বলা যাবে না, বলতে হবে থাকত। ওরা কেউ শখ করে এ শহরে থাকতে আসেনি, আইলায় কারও ঘর ভেসে গিয়েছিল, কেউ বা পেটের টানে, কেউ বা জমি-জিরেত হারিয়ে দু-মুঠো অন্নের খোঁজে এই শহরে এসেছে। নোনাডাঙায় রাজুদের দরমাঘেরা ছোট্ট ঘুপচি ঘরগুলি সব বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিয়েছে। রোজ আসা-যাওয়ার পথে আপনারা নিশ্চয়ই কোনও না কোনওদিন রাজুকে দেখেছেন। ওর বাবা একটা ছোট্ট চায়ের দোকান চালাত। ওদের পাড়ার অনেকেরই এরকম ছোটখাটো দরমা আর প্লাস্টিক ঘেরা দোকানঘর ছিল। কেউ অবশ্য ভ্যান চালাত, কেউ কলের মিস্ত্রি, কারও বাড়ির মেয়ে-বউরা বাবুর বাড়ির 'ঠিকে ঝি'। সে সব এখন গিয়েছে। ওদের সম্বল বলতে এখন শুধুই শূন্যতা।

লন্ডন শহরটা কেমন রাজু জানে না। মাথার ওপর দিয়ে যখন প্লেন উড়ে যায়, সেই উড়ন্ত বিমানের দিকে তাকিয়ে মনে মনে রাজু ভেবেছে, লন্ডন নিশ্চয়ই ভারি মজার সহর। সে শহরে সবাই দুবেলা পেট ভরে খায়। এবার এই কলকাতাও লন্ডন হয়ে উঠবে— সেরকমটা রাজুও শুনেছে। নোনাডাঙার আর সকলেও শুনেছে।

বুলডোজারটা যখন ওদের ঘরের একচিলতে দরমার ঘরগুলো গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল— পুলিশের শক্ত বুটের লাথিতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছিল এতদিন সঞ্চিত ওদের গরিবের সংসারের সামান্য দু-চারটি জিনিস, ঠিক তখনও মাথার ওপর দিয়ে একটি দ্রুতগতি বিমান উড়ে যাচ্ছিল পশ্চিমের দিকে। কে জানে সে লন্ডনের দিকেই যাচ্ছিল কিনা। সেই উড়ন্ত বিমানের দিকে আর ফিরেও তাকায়নি রাজু। বরং পুলিশের পা ধরে বলেছিল— 'একটু দয়া করুন স্যার। ওই ঘরে আমার পড়ার বইগুলি আছে।' শোনেনি পুলিশ। সবুট লাথি রাজুকে ছিটকে দিয়েছিল দূরে। চারদিকে তখন কান্না আর চিৎকার। বুট আর লাথির সদম্ভ দাপাদাপি। একটু পরে আগুন লাগল ঝুপড়িগুলিতে। একটার পর একটা জ্বলে ছাই হতে লাগল। কান্নার রোল আর একটু বাড়ল— এই যা। বুট এবং লাঠির বেষ্টনী ডিঙিয়ে কেউ এগতে পারল না এতদিনের সঞ্চিত সামান্য জিনিসগুলিকে বুক দিয়ে আগলাতে। যাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন, তাঁরা আগুনের শিখা দেখে গাড়ির গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাস্তার ধারে। কেউ কেউ জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন। কেউ কেউ বলেই ফেললেন— 'এই ঝুপড়িগুলিকে তুলে দেওয়াই উচিত। অ্যান্টিসোশালদের আখড়া। রাবিশ।' শুধু রাজু বুঝতে পারল— তার আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া হবে না। ওই আগুনে তার সব বই পুড়ে গিয়েছে।

এবার থেকে কলকাতা এলে মাছভাজা খাওয়াতে হবে। গালে সুমিষ্ট টোল ফেলে নায়ক এই আবদারটি করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রীও সস্নেহ হাসিতে সেই আবদারে প্রশ্রয় দিয়েছেন। মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে তখন নায়ককে ঘিরে ছোট-বড়- মেজ সব মন্ত্রীর ভিড়। নায়ক সবেমাত্র পা রেখেছেন কলকাতায়। বিমানবন্দর থেকে সোজা মহাকরণ। তারপর গালে সুমিষ্ট টোল ফেলে সেই অমোঘ ডায়লগটি উচ্চারণ— 'আমি কলকাতাকে ভালোবাসি। কলকাতার সঙ্গে আমার কতদিনের যোগাযোগ।' পেশাদার নায়ক স্ক্রিপ্টের বাইরে যান না। আজকের স্ক্রিপ্টে ঠিক এরকমই লিখে দেওয়া ছিল। দু-চারটে বাংলা শব্দও শিখে এসেছেন নায়ক। ভাঙা ভাঙা বাংলাও বললেন। সে বাংলা শুনে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সলজ্জ মিষ্টি হাসি। একটা উৎসব উৎসব ব্যাপার আজ। আসমুদ্র হিমাচল যে নায়কের জন্য সারা রাত গলা ফাটাতে রাজি, সেই নায়ক কেমন কলকাতায় পা ফেলেই সুড়সুড় করে চলে এলেন মহাকরণে। তারপর পাক্কা পঞ্চান্ন মিনিট মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। এক কথায় বাংলার

‘ব্রান্ড অ্যামবাসাডর’ হতে রাজি। পারিশ্রমিক শুধু একটুকরো মাছভাজা। ভাবা যায়— স্বপ্নের নায়কের চাহিদা এতটুকুই। আজ তো মুখ্যমন্ত্রীর গর্বিত হওয়ার দিন। কলকাতা তো এভাবেই একদিন লন্ডন হবে।

গতবারের সাড়ে কুড়ি লাখ টাকা ট্যাক্স দেওয়া হয়নি কলকাতা কর্পোরেশনকে। আর এবারের সত্তর লাখ। সব মিলিয়ে প্রায় এক কোটি। এ ট্যাক্স কলকাতা কর্পোরেশন কবে পাবে কেউ জানে না। অনেকেই জনান্তিকে বলছেন, ট্যাক্সের টাকা ‘ম্যানেজ’ হয়ে যাবে। মুম্বাইয়ের রানওয়ে থেকে কলকাতার দিকে বিমানটি ছাড়ার আগেই কে যেন নায়ককে কানে কানে বলে দিয়েছিল— একটু মিষ্টি হাসি দিয়ে ম্যানেজ করবেন ব্যাপারটা। ওখানে তো আপনি ব্যবসা করতে যাচ্ছেন। দু-একটা ভাঙা বাংলা— গালে একটু টোল ফেলা হাসি— ব্যস... এটুকুই তো আপনার ইনভেস্টমেন্ট। পেশাদার নায়কের স্ক্রিপ্ট বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বিমানবন্দর থেকে সোজা মহাকরণ। মাছভাজা খাওয়ার বায়না। মিষ্টি হাসির সঙ্গে ‘আমি কলকাতাকে ভালোবাসি।’ পাশে মুগ্ধ মুখ্যমন্ত্রী। পিছনে নায়কের সঙ্গে ক্যামেরায় মুখ দেখাতে ব্যস্ত টালিগঞ্জের বারোয়ারি পুজো কমিটির কর্তা, আসানসোলের উকিল, অ্যান্ড্রু ইউলের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার, ফিকির প্রাক্তন কর্তা— সরকারের মুড়ি ও মিছরি সকলেই। কলকাতা তো একদিন কল্লোলিনী লন্ডন হবে। এই উৎসবের দিনে কে মনে রাখে ব্রান্ড অ্যামবাসাডর নব্বই লক্ষ টাকা ট্যাক্স বাকি রেখেছেন।

রীতা পাত্র। আমি নিশ্চিত যে, রাজু হালদারের মতো এঁকেও আপনি চেনেন না। এঁর দরমার ঝুপড়িটিও বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বুলডোজার যখন ঝুপড়িটি গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, তখনও রীতা পাত্রর বিশ্বাস হয়নি এরকম হতে পারে। কেননা, এর আগে বরাবর উনি শুনে এসেছেন— গরিব মানুষের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন, তিনিই এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেই তাঁরই আমলে কী অনায়াসে বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিল রীতাদের ঝুপড়িগুলি। চোখের জল মুছতে মুছতেই রীতা পা মিলিয়েছিলেন পুনর্বাসনের দাবিতে মিছিলে। মিছিল রুবির মোড়ে আসতে না আসতেই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মাথায় হেলমেট, লাঠি হাতে পুলিশ। তাঁকে জাপটে ধরে পেড়ে ফেলল মাটির ওপর। তারপর তলপেট লক্ষ্য করে লাথি। অন্তঃসত্ত্বা রীতার তলপেটে লাথি মারার জন্যই মুখিয়ে ছিল পুলিশের বুট। পুলিশের লাঠির আঘাত মাথায় নিয়ে কৃষ্ণা দাসের স্বামী এখন হাসপাতালে। বছর খানেকের ছেলে কোলে নিয়ে কৃষ্ণার আশ্রয় বলতে এখন উন্মুক্ত আকাশ। ঘর পুড়ে গিয়েছে। বাচ্চার দুধের টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবেন বুঝতে পারছেন না। পুলিশের লাঠি এঁদের সবাইকে রক্তাক্ত করেছে। উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া এই মহিলাদের রুখতে কোনও মহিলা পুলিশ পাঠানোর বিলাসিতা অবশ্য সরকার দেখায়নি। হাতে লাঠি, মাথায় হেলমেট পুরুষরাই এই গৃহহীন মহিলাদের শাড়ির আঁচল ধরে টেনেছে, তাঁদের জাপটে ধরে রাস্তায় ফেলেছে এবং প্রকাশ্যে শরীরের যত্রতত্র স্থানে নির্বিচারে লাঠিপেটা করেছে।

এরকম যখন চলছে, ঠিক তখনই, টিভি চ্যানেলের গাড়িটা এসে থেমেছিল বাইপাসের ধারে। আঁটোসাঁটো জিনস, প্রিন্টেড টপ আর গায়ে বিদেশি সুগন্ধী— তরুণী রিপোর্টারটি নেমে এসেছিলেন গাড়ি থেকে। পাশে তাঁর ক্যামেরাম্যান। তরুণী রিপোর্টারের শ্যাম্পু করা চুল মাঝে মাঝে কপালের ওপর নেমে আসছিল। হাত দিয়ে চুল সরিয়ে নিতে নিতে রিপোর্টার এক ঝলক দেখে নিলেন চারপাশ। রাজু হালদার, রীতা পাত্র, জ্যোৎস্না মন্ডল, গোপাল ভদ্ররা তাঁর বৃত্তের বাইরে থেকে গেলেন। ওঁদের বৃত্তের বাইরে থাকতেই হবে। কেননা, কলকাতাকে লন্ডন করে তোলার জন্য রাস্তার ধারে বিসদৃশ ঝুপড়ি উচ্ছেদ যে কত জরুরি— সেটাই দেখাতে হবে চ্যানেলে। তদুপরি, আদুর গা বা ছেঁড়া জামা পরিহিত শীর্ণ জীর্ণ গরিব-গুরবো দেখালে চ্যানেলের টি আর পি বাড়ে না। অতএব আঁটোসাঁটো জিনস, প্রিন্টেড টপ, গায়ে সুগন্ধী পাকড়ে ফেললেন, রাস্তার ধারে ভিড় করে রগড় দেখতে থাকা কয়েকজন সুবেশা পুরুষ-রমণীকে। ক্যামেরা তাক করা হলো তাঁদের মুখে। একের পর এক স্মার্ট প্রশ্ন করতে শুরু করলেন তরুণী সাংবাদিক— ‘এই নোনাডাঙার অনেকেই সরকারের দেওয়া ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে ঝুপড়িতে থাকেন, তাই না? এই ঝুপড়িগুলি তো অ্যান্টিসোশালদের আখড়া, তাই না? এসব গন্ডগোলের পিছনে নকশালরা আছে, তাই না? কলকাতাকে আরও সুন্দর করতে হলে এদের উচ্ছেদ করে রাস্তা আরও চওড়া করতে হবে।— তাই না? বলুন, বলুন, বলুন...’। টিভি চ্যানেলে সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল একই উত্তর— ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ...’

মুখ্যমন্ত্রী খুশি হলেন।

লেখাটি এখানেই শেষ করে দিতে পারতাম। তবু শেষের আগে এই শহরেরই এক প্রয়াত কবির একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করছি—

অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওংকার
সে অন্নে যে বিষ দেয়, কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।

বর্তমান ৯/০৪/২০১২

মাইনে কেটে কণ্ঠরোধ করা যায় না

পরিচয় কানুনগো

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি (২০১২) তারিখের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে মমতা ব্যানার্জি সরকার পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী নির্বিশেষে যে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, তা সত্তর দশকের পর এ রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। সরকার-বিরোধী ধর্মঘট হলে, সরকার প্রশাসন চালু রাখার চেষ্টা করে, অতিরিক্ত সরকারি বাস-ট্রাম পথে নামায়, এ অভিজ্ঞতা এ রাজ্যের মানুষের আছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন, তখন তিনি কম বন্‌ধ ডাকেন নি এবং বামফ্রন্ট সরকার বন্‌ধ-বিরোধী যে ব্যবস্থাগুলি নিত, সেগুলিকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিতে ভুলে গেছেন, এমন নজিরও আমরা প্রত্যক্ষ করি নি। তবে, বামফ্রন্ট আমলে বন্ধ-ধর্মঘটের ভিন্ন এক শ্রেণী-বিভাজন ছিল। স্ব-দলীয় বন্‌ধ-ধর্মঘট 'গণতান্ত্রিক' আর অন্য দলীয় হলেই 'অগণতান্ত্রিক'— এরকম চরিত্র বিশ্লেষণ অ-বাম আমলে দৃষ্টিগোচর হয় নি। বামফ্রন্ট সরকারকে 'চোখের মণির মতো রক্ষাকারী' সংগঠনগুলি 'গণতান্ত্রিক' বন্ধ-ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হওয়ার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানাত এবং 'অগণতান্ত্রিক' বন্‌ধ-ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য শ্লোগান-সমাবেশ, হুমকি, আগের দিন অফিসে অফিসে কর্মচারীদের আটকে রাখার ব্যবস্থা, ডান্ডা ও ঝান্ডা ধরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি বহুবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে 'শ্রেণী সংগ্রাম' পরিচালনা করত। এ ছাড়া আর এক রেওয়াজ চালু হয়েছিল। জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে গৃহীত কর্মসূচীগুলির ক্ষেত্রে, এ রাজ্যের সংগঠনগুলি পোস্টারে, লিফলেটে লিখে দিত "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে নয়"। সমস্ত রাজ্যে যখন কর্মচারীরা ছুটি নিয়ে, কাজের সময়ে কর্মসূচী পালন করছেন, এ রাজ্যে সরকারি কাজে বিঘ্ন না ঘটিয়ে ছুটির পর সন্ধ্যাবেলায় সেই একই কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। ত্রিপুরা, কেরালাতে কী হয়ে এসেছে জানি না। তবে এ রাজ্যে কর্মচারী আন্দোলনের ধারাটি বিশীর্ণ, শুষ্ক খাতে পরিণত করা হয়েছিল। যেটুকু ছিল, তা সরকার অননুগৃহীত প্রতিবাদী সংগঠনগুলির দৌলতেই টিকে ছিল। যদিও অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা শেষোক্ত ধারাটিকেও পুষ্ট হতে দেয় নি।

এরকম এক নষ্ট জমির উপর দাঁড়িয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি-র ধর্মঘটে এ রাজ্যের কর্মচারীরা যতটুকু অংশগহণ করেছেন, তাতে সাংগঠনিক উদ্যোগের থেকে স্বতঃস্ফূর্ততার অবদানই বেশি। উদ্যোক্তা সংগঠনগুলি ছাড়াও আরও অনেক প্রতিবাদী সংগঠন নানাভাবে এই ধর্মঘটে অংশীদার হয়েছে এবং বলা ভালো, বর্তমান তৃণমূল সরকারের তীব্র দমননীতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকারীরা অভূতপূর্ব মনোবল প্রদর্শন করেছে। এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ শ্রমজীবী মানুষের মজুরি ও অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কিছু দাবিতে। মূলত কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী এই ধর্মঘটে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সেরকম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। দেশের সব কয়টি রাজ্যে ধর্মঘট ডাকা হলেও, কোন রাজ্যই তাদের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি হঠাৎ কেন এই ধর্মঘটে নিজেকে প্রতিপক্ষ ভেবে বসলেন, তা অনুমান করা খুব একটা কষ্টকর নয়। ধর্মঘট বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে তিনি সম্ভবত মালিক-ব্যবসায়ী মহলে আশ্বাসবাণী পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, যে প্রয়াস তাঁর পূর্বসূরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও নিয়েছিলেন।

মমতা সরকারের বয়স এখনও এক বছর পেরোয়নি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই সরকারের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে। কণ্ঠরোধের চেষ্টা, সমস্ত প্রকার মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নস্যাৎ করার অপচেষ্টা। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্ন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের 'গ্রন্থাগার বিরোধ'— কোন ক্ষেত্রেই মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, বাক-স্বাধীনতা হরণ করতে বর্তমান সরকার চক্ষুলজ্জার বালাই রাখছে না। পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্র দলতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রকে প্রতিস্থাপিত করেছে। ক্ষমতায় এলে ক্ষমতার ভাষা বদলে যায়। সিপিএম-এর বদলেছিল, তৃণমূলেরই বা বদলাবে না কেন? তফাৎ একটাই, সিপিএম একটা তাত্ত্বিক মোড়ক দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, এখন নেত্রী উবাচ।

বস্তুত বিষয়বস্তুর বিচারে ২৮ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট খুব বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, তা নয়। সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীদের প্রতি তৃণমূল সরকারের হুমকি এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এই ধর্মঘটে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। সরকারের যদি ধর্মঘট বিরোধিতা করার অধিকার থাকে, কর্মচারীদেরই বা সমর্থন করার অধিকার থাকবে না কেন? এই ধর্মঘট অসাংবিধানিক নয়, অগণতান্ত্রিকও নয়। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার এই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করেনি। বাম সংগঠনগুলির প্রতি আনুগত্যে নয়, এই স্বাধিকারের প্রশ্নেই বহু মানুষ এই ধর্মঘটে অংশীদার হয়েছিলেন। এমন কী যে সব মানুষ বা সংগঠন 'পরিবর্তনের' স্বার্থে মমতা ব্যানার্জির সাথী হয়েছিলেন, তাঁরাও শিক্ষক-কর্মচারীদের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন নি। ২৯ তারিখে সংবাদপত্রের শিরোনামে আক্ষেপ 'বদল হল না বঙ্গ-মানসে, হুঁশিয়ারির জেরে মহাকরণে ভিড়, ছুটিতে রাজপথ' প্রমাণ করে যে, মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি বরদাস্ত করেনি।

এখন প্রশ্ন হল, ২৮ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে, সরকার যে আদেশ জারি করেছে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা

কতদূর নীতিসম্মত বা বিধিসম্মত। মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিবহন মন্ত্রী চাকুরি-ছেদের হুমকি দিলেন, শ্রমমন্ত্রী ঘোষণা করলেন 'মহাকরণ কারখানার গেট নয় আর অধিকাংশ সরকারি কর্মীরা কায়িক পরিশ্রম করেন না', সুতরাং তাদের ট্রেড ইউইনয়ন অধিকার নেই। সংবিধান কোথাও বলে নি একমাত্র কারখানা গেটে ইউনিয়ন করা যাবে। একমাত্র শিক্ষামন্ত্রী নিজে শিক্ষক বলেই সম্ভবত অন্য মন্ত্রীদের সুরে সুর মেলাতে পারেন নি। শিক্ষকদের ধর্মঘটের অধিকার শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করলেও কৈফিয়ৎ তলবের সার্কুলার জারি করা থেকে নিজের দপ্তরকে বিরত করতে পারেন নি। সরকারি কর্মচারীরা, স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও অনেকাংশে ঔপনিবেশিক ভাবধারার শিকার। সংবিধান সরকারি কর্মচারীদের যে অধিকার দিয়েছে, আজ পর্যন্ত কোন সরকারই তার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়নি। তৎসত্ত্বেও আংশিক ভাবেও যেটুকু বিধিবদ্ধ অধিকার তাঁরা অর্জন করেছেন, তর্জনগর্জন করে সে অধিকার অস্বীকার করার ক্ষমতা সরকারের নেই।

সরকারি কর্মচারীদের চাকুরিবিধি, মূলত সংবিধানের ৩০৯, ৩১০, ৩১১ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ৩০৯ ধারা অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের চাকুরিবিধি সংশ্লিষ্ট আইনসভায় (অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সংসদ এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিধানসভা) প্রণীত হওয়ার কথা। কিন্তু হয় না। পনেরটি সাধারণ নির্বাচনের পরেও আজ পর্যন্ত বিষয়টি কোন লোকসভা বা বিধানসভায় উত্থাপিত পর্যন্ত হলো না। প্রশাসনিক আদেশে সরকারি কর্মচারীদের আচরণ বিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। সাংবিধানিক ধারাগুলি ১৯৩৫ সালের ঔপনিবেশিক গভরমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টের পুনরাবৃত্তি। প্রশাসনিক নিয়মাবলীও ঔপনিবেশিক ভাবধারার অনুসারী।

তারই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের আচরণ বিধির এক বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮০ সালের ৪ জুন, কুখ্যাত সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল (১৯৫৯) বাতিল করে ডিউটিজ, রাইটস এ্যান্ড ওবলিগেশন (ডিআরও) বিধি চালু করে। এই বিধিতে, কিছু উচ্চ পদাধিকারি ব্যতীত সকল কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন এবং ধর্মঘট করার অধিকার দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া ব্যতিরেকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের কথাও বলা হয়। ধর্মঘট বলতে শিল্প বিরোধ আইনে নির্দ্দিষ্ট ধর্মঘটের কথাই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার কিছুটা উল্টেপথে হেঁটে, ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে আবার ঐ পুরাতন কন্ডাক্ট রুল ফিরিয়ে আনে। বলা হলো, ''এই আইনের (ডিআরও) কোন কিছুই ১৯৫৯ সালের সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলের মর্যাদা হানি করছে বলে মনে করা হবে না''। কন্ডাক্ট রুলকে যদি মর্যাদা দিতে হয়, তা হলে বিক্ষোভ-সমাবেশ সব কিছুই বাতিল করতে হয়। দ্বিতীয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, সেটা হলো, অধিকার দেওয়া হলেও ধর্মঘট সম্পর্কিত শাস্তিমূলক ধারাগুলি সার্ভিস রুল থেকে বামফ্রন্ট সরকার প্রত্যাহার করেনি। যাই হোক, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কিছু স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার আছে। আর এটাও স্পষ্ট, ডিআরও রুল বর্তমানে অর্থাৎ ধর্মঘটের অধিকার যতদিন বলবৎ আছে, আইনত সরকার কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৮ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে দুটি আদেশ জারি করেছে। প্রথম আদেশে (২১ ফেব্রুয়ারি) বলা হলো, ২৮ তারিখে অনুপস্থিতির জন্য কোন ছুটি গ্রাহ্য হবে না। দ্বিতীয় আদেশে (৬ মার্চ) বলা হলো, বিশেষ পাঁচটি কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ক্ষেত্রে উক্ত দিনটি 'dies non' হিসাবে গণ্য করা হবে এবং ঐ দিনের বেতন দেওয়া হবে না। অবশ্য অতিবাহিত চাকুরিতে এর কোন প্রভাব পড়বে না। দুটি আদেশই একমাত্র সরকারই কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট এবং কোন আদেশেই আইন বা বিধির উল্লেখ নেই। কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে একমাত্র 'অসদাচরণ' বা misconduct- এর কারণে। অনুপস্থিত থেকে কর্মচারীরা অসদাচরণ করেছে কী না, সে বিষয়ে সরকার নিজেই নিশ্চিত নয়। আইনের উল্লেখ করে সরকার তাই ঝুঁকি নিতে চায়নি। শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে উক্ত ৬ মার্চের সার্কুলারের নকল পাঠিয়ে সমস্ত অনুপস্থিত শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের থেকে কৈফিয়ৎ তলব করলেন। প্রাথমিক শিক্ষক সহ বিভিন্ন বেসরকারি কর্মচারীদের কৈফিয়ৎ তলব করা হলো। সরকারি কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট সার্কুলার বেসরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যে নির্বুদ্ধিতার নামান্তর, এটা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পরে না। শিক্ষা বিভাগে অশিক্ষার এমন আধিপত্য এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

মাইনে কেটে বা শাস্তি দিয়ে কণ্ঠরোধ করা যায় না। এ প্রচেষ্টা যারাই নিয়েছে, তারাই স্বখাত সলিলে ডুবেছে। মমতা ব্যানার্জী সরকারের ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারী আন্দোলনের মরা গাঙে আবার স্রোত ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। বিগত তিন দশক ধরে যাঁরা সরকারকে আড়াল করে নকল আন্দোলনের খেলায় কর্মচারীদের মজিয়ে রেখেছিলেন, জানিনা তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হয়েছে কী না। দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে প্রকৃত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের অবশিষ্ট আছে কী না, সেটাও গবেষণার বিষয়। এই আক্রমণ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। সমাজের সর্বস্তরে নাগরিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বিপন্ন। বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে পুঁজি ছাড়া আর কারোর কোন অধিকার গ্রাহ্য নয়। আজকের আক্রমণ অনাগত দিনের আক্রমণের পূর্বাভাস। এই পরিস্থিতিতে কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন কী না, কর্মচারী আন্দোলনকে তাঁরা পুনর্জীবিত করতে পারবেন কী না, সে পরীক্ষা কর্মচারীদেরই দিতে হবে।

ঘটনাপ্রবাহ

'অদৃশ্য হাত' তো বটেই, কিন্তু কার হাত, এবং কার দিকে?

ধারা চট্টোপাধ্যায়

ভারতের মহামান্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছেন : তামিলনাড়ুর কুদানকুলাম-এর প্রস্তাবিত পারমাণবিক বৈদ্যুতিক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণআন্দোলন চলছে, তার পিছনে আসলে রয়েছে মার্কিন ও স্ক্যান্ডিন্যাভিয়ান কিছু এনজিও'র 'অদৃশ্য হাত' বা মদত। পরবর্তীকালে অভিযোগ তোলা হয়েছে একজন জার্মান নাগরিকের বিরুদ্ধেও। খুবই গুরুতর অভিযোগ সন্দেহ নেই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, আমাদের 'সম্মানিত ও সর্বজ্ঞ' প্রধানমন্ত্রীর কথা তো ভারতীয় বিচারবিধি অনুসারে এমনকি ভারতের কোনো আদালতেও 'প্রমাণ' হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না! আর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বলেই যদি তাঁকে দু'হাত তুলে উদ্বাহু হয়ে সমর্থন জানাতে হয়, তাহলে তো ভারতের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার মূল কারণ ভারতের উপর দু'শো বছর ধরে চাপিয়ে রাখা যে ঔপনিবেশিক শাসন, সে কথা ভুলে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁর দেওয়া চরম দাসত্বমূলক অভিনন্দন-বাণীকেও সমর্থন করতে হয়! তাই কথাটি কে বলেছেন তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমাদের বরং প্রথমে উচিত হবে উত্থাপিত অভিযোগটি সম্পর্কে একটু বিচার-বিবেচনা করে দেখা। কারণ কারও কোনো কথা বা কাজ পছন্দ না হলেই সে-সম্পর্কে প্রমাণহীন কুৎসা রচনা করা, বা তাকে 'অমুকের বা তমুকের মদতপুষ্ট' বলে চিহ্নিত করাটা আমাদের, বিশেষত সরকার বা ক্ষমতাসীনদের 'জাতীয়' চরিত্রেরই প্রায় অঙ্গ। কিছু ব্যতিক্রমী এনজিও এখনও আছে, যারা সেই গোত্রের নয়, বরং তারা সাধ্যমতো নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী, অর্থাৎ বিদেশি অর্থ না নিয়ে, মানুষের স্বার্থেই কাজ করার চেষ্টা করে। তাই খোলা মনে তথ্যের ভিত্তিতেই শুধু সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো উচিত।

কুদানকুলাম গণআন্দোলন সম্পর্কে মনমোহন সিং-এর উত্থাপিত অভিযোগটি কি আন্দোলনের মূল ইস্যুকে গুলিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াবার প্রচেষ্টা? উল্লেখ্য যে, ঠিক একইভাবে কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের জয়িতাপুর পারমাণবিক বৈদ্যুতিক প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রসঙ্গে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বিরাজ চৌহান কিংবা আসামের নিম্ন সুবনসিড়ি জলবাঁধ প্রকল্প-বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গোহাই-ও একইরকম ভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই বিদেশি অর্থ ও বিদেশি স্বার্থের অভিযোগ তুলেছেন। এসব অভিযোগ তুলে কি একথাই বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে যে, এদেশের মানুষ নিজেদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হলেও বা সুনিশ্চিত উচ্ছেদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সেসবের বিরুদ্ধে নিজেদের উদ্যোগে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম? সারা দেশ জুড়েই তো এই মুহূর্তে ব্যাপক গণআন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে উঠছে– বিভিন্ন পারমাণবিক বৈদ্যুতিক প্রকল্প, ইস্পাত প্রকল্প, খনি প্রকল্প, বাঁধ, হাইওয়ে বা পরিকাঠামোগত প্রকল্পের বিরুদ্ধে, সেগুলির ব্যাপক জনস্বার্থ-বিরোধী চরিত্রের কারণে। এই সব আন্দোলনেই একের পর এক ১৬জন কৃষক মৃত্যুবরণ করেছেন কলিঙ্গনগরে, ১৪জন নন্দীগ্রামে, ৩জন সোমপেটায়, ৪জন ভট্টা-পারাশুলে। তাহলে কি তাঁদের মৃত্যুরও মূল উদ্দেশ্য বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের বা কোনো এনজিও-র স্বার্থসিদ্ধি? এই সব গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সব জঘন্য কুৎসা কি, শেষ বিচারে, ব্যাপক মানুষকেই হেয় করা বা জনস্বার্থকেই বিঘ্নিত করা নয়?

হাজার গুণ বেড়ে গেছে ভারতের বিদেশ-নির্ভরতা বা দেশের উপর বিদেশের খবরদারি ও প্রভুত্ব। মার্কিন শাসকশ্রেণীর চাপে ভারত নিজের গলায় বেঁধেছে পরমাণু চুক্তির করাল ফাঁস। দিন দিন তারপর থেকেই বেড়ে চলেছে সবচেয়ে ধনী ও স্বচ্ছল ১৫-২০ শতাংশের সমৃদ্ধি, আর বিপরীতে বাড়ছে বাকি সব মানুষের সংকট-বেকারি-ছাঁটাই-বিপন্নতা ও অনাহারের তীব্রতা, বাড়ছে নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতির শিকার লক্ষ লক্ষ বিপন্ন কৃষকের আত্মহত্যার সংখ্যা। যাঁর প্রদর্শিত পথে যাত্রা করে মানুষের সর্বনাশ বাড়ছে, সেই মনমোহন সিং ও তাঁর উৎসাহী সহযোগী মন্টেক সিং-চিদাম্বরম এবং তাদের ভাইবেরাদারদের চেতনা ও কার্যকলাপ তথা অতীত ও বর্তমানই তো সবচেয়ে বেশি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী বিশ্বব্যাংকের সাথে। তাঁরাই তো প্রকৃত অর্থে এদেশে এই মুহূর্তে বিদেশিদের সবচেয়ে মদতপুষ্ট এবং মদতদার।

২০১১ সালের প্রথম দিকে আরটিআই আইন অনুসারে প্রাপ্ত একটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল: ২০১০-এর মার্চ মাস পর্যন্ত সময়কালে ভারতের মোট ঋণের পরিমাণ বিশ্বব্যাংকের কাছে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি, আর এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কাছে প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা। আমাদের দেশের বিদেশি অর্থ পাওয়া এনজিওগুলিকে তো অন্তত প্রতি বছর অডিট-করা হিসেবপত্র পেশ করতে হয়, কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এটাই যে, সরকারিভাবে বিদেশ থেকে পাওয়া উপরে দেওয়া লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার কোনো হিসেব বা তার কার্যকারিতা সম্পর্কে রিপোর্ট এমনকি দেশের পার্লামেন্টে পর্যন্ত পেশ করতে হয় না। তাহলে এদেশে বিদেশ থেকে পাওয়ার জন্য কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার, তা-ও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই, ন্যূনতম নৈতিক অধিকার কীভাবে সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রীর থাকতে পারে?

প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলির টাকা খেয়ে কুদানকুলাম নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করছেন তাঁদের একজন হলেন ড. এস পি উদয়কুমার। প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযোগের বিরুদ্ধে ড. উদয়কুমার তাঁকে উকিলের চিঠি দিয়েছেন। তার একটি অংশ নিচে দেওয়া হলো:

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি থেকে টাকা পাওয়া এনজিও-গুলির জন্য পারমাণবিক গবেষণা কর্মসূচি সমস্যায় পড়েছে, তারা আমাদের দেশের শক্তির যোগান বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয় না— আপনার এই মিথ্যা বিবৃতিতে আমার মক্কেল গভীরভাবে আহত। মনে হয় যে তামিলনাড়ুর কুদানকুলাম নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ চলছে তাতে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলির পয়সা আসছে সেকথা জনগণকে জানানোর জন্যই আপনি এই বিবৃতি দিয়েছেন। এই প্রতিবাদের সমন্বয়কারী আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে এই বিবৃতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আমার মক্কেল জানাচ্ছেন যে আপনি তাঁর সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশে এই মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার সাক্ষাৎকারে এই বিবৃতিটি সাধারণের চোখে আমার মক্কেলের নৈতিক চরিত্রের হানি ঘটাবে এবং তাঁর সুনামেরও হানি ঘটাবে। ঐ প্রতিবাদের পয়সা যোগাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি— আপনার এই বক্তব্য একেবারে মিথ্যা। এটি 'মানহানি'-র মধ্যে পড়ে।

আমার মক্কেল আশা করেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনি ঐ বিবৃতির প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেবেন এবং তাঁকে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য করবেন না।

আর বিদেশি মদতের কথা উঠলে তো ঘটনা গড়াবে অনেক দূর। স্পেন গৃহযুদ্ধের সময় স্পেনের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের সাহায্যের জন্য 'স্পেন বাঁচাও তহবিল' তুলেছিলেন জওহরলাল নেহরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস ডাক্তার হিসেবে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ আর অনেক ভারতীয় নেতার সহযোগিতায় চীনের গৃহযুদ্ধে ডাক্তার হিসেবে যোগ দেন। ভারতের অক্সফোর্ড শিক্ষিত উদারনৈতিক প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই এঁদের বিরুদ্ধেও 'বিদেশি মদতপুষ্ট' উস্কানিদাতার অভিযোগ আনবেন!

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর উত্থাপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে কুদানকুলাম-এর প্রস্তাবিত পারমাণবিক বৈদ্যুতিক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা আদালতে মামলা রুজু করেছেন।

পুনশ্চ : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী জয়ললিতা-র কোদানকুলম নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ে রাজনীতি ভারতের সংসদ-কেন্দ্রিক রাজনীতির দৈন্যদশা আর একবার প্রকট করলো। তামিলনাড়ুর যে অংশে এই নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, সেই বিধায়ক ক্ষেত্রে একটি উপনির্বাচনে জয়ললিতার পার্টি, এআইএডিএমকে-র হাল ছিল খারাপ। এমনিতেই অপরিকল্পিত, দূষণ-প্রবণ শিল্পায়নের ফলে তামিলনাড়ুতে বিদ্যুৎ অপচয় দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে রেখেছে। বিদ্যুৎ অপচয় এবং বেখাপ্পা হারে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে তামিলনাড়ুতে দৈনিক বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ চার হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যুৎ রেশনের কারণে সপ্তাহে একদিন, কোনও কোনও স্থানে একাধিক দিন, ঐ রাজ্যে শিল্পসংস্থার উৎপাদন বন্ধ রাখা বাধ্যতামূলক। এমন অবস্থায় তামিলনাড়ু চেম্বার অফ কমার্স এবং বিরোধী দল ডিএমকে এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্বপক্ষে বিরাট আকারে সওয়াল করে। কৌশলের খাতিরে জয়ললিতা সরকার সাময়িক সিদ্ধান্ত নেয় (হরিপুরে মমতা সরকারের নিউক্লিয়ার-বিরোধী সিদ্ধান্ত কি সেই একই ইঙ্গিতবাহী?) যে তারা মানুষের বিক্ষোভকে মান্যতা দিয়ে এই নিউক্লিয়ার শক্তি-কেন্দ্রের বিরোধিতা করবে। স্থানীয় মানুষ খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে জয়ললিতার প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করে।

ঠিক যেদিন উপনির্বাচন সমাপ্ত হয়, সেই দিন বিকেলেই তামিলনাড়ু সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত দুজন 'বিশেষজ্ঞ' ২৩ বছরের পুরোনো একটি রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় যে এই নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রটি মোটেই বিপজ্জনক নয়— অতএব তামিলনাড়ু সরকার এই শক্তিকেন্দ্রের বিরোধিতা করবেই না— বরং তারা এই শক্তিকেন্দ্র যাতে দ্রুত শক্তি উৎপাদন করে তার জন্য কেন্দ্রকে চাপ দেবে।

পাশাপাশি তামিলনাড়ু সরকার তার নিজস্ব কোষাগার থেকে ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে 'স্থানীয় উন্নয়ন' করবে— যদিও এই উন্নয়নে স্থানীয় মানুষের চেয়ে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনকে ভরতুকি দেওয়াটাই মূল বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তামিলনাড়ু সরকার এক সময়ে এই শক্তিকেন্দ্রের বিরোধী কর্মীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় পুলিশ প্রতিরোধ খানিকটা কমিয়ে এনেছিল। এখন তারা এই শক্তিকেন্দ্রের সমর্থক বনে গিয়ে বিরোধীদের ওপর প্রচণ্ড দমন-পীড়ন নামিয়ে এনেছে। ছেঁদো সব অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এই আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় কর্মী এস পি উদয়কুমারের বাড়িয়ে তল্লাশির জন্য হানা দিয়েছে। সরকার ইডিনথাক্কাল অঞ্চলে একটি স্থায়ী পুলিশ ছাউনি নির্মাণ করে গ্রামবাসীদের এবং আন্দোলনের কর্মীদের হেনস্থা করেছে। এই পুলিশ ছাউনি পরিচালনার কাছে রয়েছে অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ।

স্থানীয় মানুষরা মনে করেন যে জয়ললিতা ভুয়ো প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনটিকে তাঁর নিজস্ব নির্বাচনী ফায়দা তোলার কাজে ব্যবহার করে মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাঁরা এই শিক্ষা নিয়ে এখন ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর ময়দানে সমাবেশিত হয়েছেন।

Ni¸‰î

কবিতা পড়া শুরু করার আগে...

তড়িৎ চৌধুরী

আমার এই কবিতা পড়া শুরু করার আগে
আপনাদের অনুরোধ করবো এক মুহূর্ত নীরবতা পালন করার জন্য
সেই মানুষগুলির সম্মানে, যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আর পেন্টাগন দপ্তরে—
২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণে।

আমার এই কবিতা পড়া শুরু করার আগে
আমি আপনাদের অনুরোধ করবো আরও এক মুহূর্ত নীরবতা পালন করার জন্য
সেই মানুষগুলির স্মৃতিতে যাঁরা হয়রান হয়েছেন, জেলে গেছেন,
উবে গেছেন, নির্যাতিত, ধর্ষিত বা নিহত হয়েছেন
সেই আক্রমণের প্রতিশোধ হিসেবে—
আফগানিস্তান ও মার্কিন দু' দেশেই।

আর আমাকে যদি আর একটা বলে নেবার সুযোগ দেন...

তাহলে অনুরোধ করবো
একটা পুরো দিন নীরবতা পালন করার জন্য
সেই লক্ষ লক্ষ প্যালেস্টাইনির জন্য
যাঁরা নিহত হয়েছেন দশক ধরে দশকের পর দশক ধরে—
মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরাইলি বাহিনীর হাতে;
ছ'মাস নীরবতা পালন করার জন্য
সেই সাড়ে ছয় লক্ষ ইরাকি মানুষের জন্য, যাঁদের অধিকাংশই আবার শিশু,
যাঁরা মারা গেছেন অপুষ্টিতে বা অনাহারে, কিংবা বন্দুকের গুলিতে—
এগারো বছর ধরে সেদেশটি মার্কিন আগ্রাসনের শিকার হবার পরিণতিতে;
দু'মাস নীরবতা পালন করার জন্য
দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের শিকার সেই সব কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য—
যাঁরা শ্বেতাঙ্গদের নিরাপত্তার অজুহাতে নিজেদের দেশেই ছিলেন পরবাসী হয়ে;
সেই সব মানুষদের জন্য ন'মাস নীরবতা পালন করার জন্য,
যেখানে আকাশ থেকে মৃত্যু নেমে এসেছিল,
প্রচণ্ড উত্তাপ গলিয়ে দিয়েছিল এমনকি কংক্রিট, ইস্পাত, আর পাথরকে,
আর মানুষকে তো বটেই—
যেখানে জীবিত মানুষ আসলে এখনও মরেই আছে।

তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি আমার কবিতা শুরু করি ?
আমার কবিতার বিষয় হচ্ছে :
কুদানকুলামে প্রস্তাবিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং...

❑ Countercurrents.org-এ প্রকাশিত অসিত দাসের
'A Moment of Silence, Before I Start this Poem' কবিতাটির অনুসরণে।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনের কয়েকটা দিক

হিরণ্ময় ধর

সদ্যসমাপ্ত উত্তরপ্রদেশ ষোড়শ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে সমাজবাদীর পার্টির জয় অভাবনীয়। যেমন অভাবনীয় ছিল গত ২০০৩ সালের নির্বাচনে বিএসপি-র বিজয়। এই অভাবনীয় ঘটনার কয়েকটা দিক বিশেষভাবে দেখার প্রয়াস করা হয়েছে এই লেখায়।

এই বিধানসভা নির্বাচনে মুলায়েম সিং-এর সমাজবাদী পার্টি (এসপি) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ৪০৩ আসনের বিধানসভায় ২২৪ আসন পেয়ে। প্রদত্ত ভোটের ২৯.১৫ শতাংশ পেয়েছে এসপি। সমস্ত নির্বাচকমণ্ডলীর (ইলেক্টরেট) মাত্র ১৭.৩৫ শতাংশ ভোট এটা। অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলীর মাত্র এক পঞ্চমাংশেরও কিছু কম ভোটদাতাদের সম্মতিতেই বাজিমাৎ। কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য লক্ষ্ণৌর তখ্‌ত-এ-তৌসে কায়েম এসপি।

ঠিক পেছনেই আছে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)— ৮০ আসন পেয়ে। প্রদত্ত ভোটের ২৫.৯১ শতাংশ— এসপি থেকে ৩.২৪ শতাংশ কম ভোট পেয়েছে মায়াবতীর বিএসপি। এটা সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর ১৫.৪২ শতাংশ অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশের কম।

২০১২ বিধানসভা নির্বাচনে এসপি এবং বিএসপি নিজেদের জায়গা পাল্টাপাল্টি করেছে। ২০০৭-এর নির্বাচনে বিএসপি ৩০ শতাংশ ভোট ও ২০৬ আসন পেয়ে প্রায় দুই দশক বাদে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। ঐ নির্বাচনে ২৫ শতাংশের কিছু বেশি ভোট ও ৯৭ আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিল এসপি (সারণী ১)। ১৯৯৬ থেকে ২০১২ পর্যন্ত এসপি ও বিএসপি-র ভোটের অংশ ক্রমশ বেড়েছে। ২০১২-তে বিএসপি-র ভোটে কিছু ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ২০০৭-এর তুলনায় কম— কিন্তু ১৯৯৬ ও ২০০২-এর তুলনায় বেশি ভোট পেয়েছে বিএসপি। তারই ফলে ২০১২ বিধানসভা নির্বাচনে ৮০টি আসন পেয়ে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় বিএসপি।

গত কয়েকটি নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনে বেশি ভোট পড়ায় অনেকেই উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন এই অতিরিক্ত ভোটটা কোথায় গিয়েছে জানার জন্য। এখন নির্বাচন পরবর্তী পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে এই নির্বাচনে মায়াবতী সরকারের এবং দল নির্বিশেষে কিছু রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে একটা anti-incumbency হাওয়া ছিল। ফলে যদিও এসপি এবং বিএসপি দুই পার্টিই নিজেদের পরম্পরাগত, প্রধানত জাতিভিত্তিক, সমর্থন বজায় রেখেছে, নির্বাচনের বাড়তি ভোটটা, অনেকে যেটাকে floating vote বলেছে, প্রায় সম্পূর্ণভাবে এসপি-র বাক্সতে পড়েছে।

এই floating ভোটটা বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের মিলিত ভোট। এই দলে বেশ কিছু সদ্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত নব্য যুবকযুবতীও আছেন। এই 'ভাসমান' ভোট কোন রাজনৈতিক দলকেই তাদের আগের নির্বাচনে জেতা সব আসনকে এবারের নির্বাচনে ধরে রাখতে দেয় নি। মোট ৪০৩ আসনের মধ্যে এই বারের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের আগের নির্বাচনে জেতা আসনের মধ্যে মাত্র ১৫৩টি আসন ধরে রাখতে পেরেছে।

যাটভ, যারা মায়াবতীর দলিত উত্তোলনের ভিত্তিভূমি, তাদের ভোটের শতকরা ভাগ ২৫, তাদের বেশ কিছু অংশ মায়াবতীর কাছ থেকে খানিকটা সরে এসেছে। সেন্টার ফর দি স্টাডি অফ সোশ্যাল সায়েন্স-এর এক হিসেবে দেখতে পাওয়া

সারণী ১

২০০২ থেকে ২০১২: উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচনের ধারা

পার্টি	২০০২		২০০৭		২০১২	
	আসন	ভোট (%)	আসন	ভোট (%)	আসন	ভোট (%)
এসপি	১৪৩	২৫.০০	৯৭	২৫.৪৩	২২৪ (+১২৭)	৩০.০
বিএসপি	৯৮	২৩.০৬	২০৬	৩০.৪৩	৮০ (- ১২৬)	২৫.৯
বিজেপি	৮৮	২০.০৮	৫১	১৬.৯৭	৪৭ (- ৪)	১৫.০
কংগ্রেস	২৫	০৮.৯৬	২২	০৮.৬৮	২৮ (+৬)	১১
আরএলডি	১৪	০২.৪৮	১০	০৩.৭০	৯ (- ১)	৩.০
অন্য	৩৫	২০.০৫	১৭	১৪.৮৬	১৫ (+৬)	১৫

উৎস: হিন্দুস্থান, মার্চ ৭, ২০১২ এবং ইন্ডিয়া টুডে, মার্চ ২০১২

যায়, ২০০৭ সালে বিএসপি ৭৯ শতাংশ যাটভ ভোট পেয়েছিল। ২০১২ সালে সেই ভোটের অংশ শতকরা ৬০-এ নেমে এসেছে। একই সময়ে এসপি-র যাটব ভোটের শতকরা অংশ ২ থেকে ১৯-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যাটব ছাড়া অন্য দলিতরা, যারা বিএসপি-র দলিত ভোটের ৯ থেকে ২১ শতাংশ, তারাও মায়াবতীর ওপর নারাজ দেখা যাচ্ছে। ২০০৭ এবং ২০০১ সালে এদের শতকরা ৫৫ জন মায়াবতীর বিএসপি-কে ভোট দিয়েছিল। ২০১২-য় এদের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৪। অন্যদিকে এসপি-র অংশ শতকরা ১৩ থেকে ২০১২-তে এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২১-এ।

শহরে ও গ্রামে, ধনী ও দরিদ্র, এক কথায় সবাই সর্বত্র এসপি-কে অপেক্ষাকৃত বেশি সমর্থন জানিয়েছেন। এই সব ক্ষেত্রে বিএসপি এবং বিজেপি দুজনেরই সমর্থন কমেছে। দুই ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের কিছুটা সমর্থন বেড়েছে। তবে এই বাড়তি ভোট তাদের অন্য ক্ষেত্রে ঘাটতি মেটাতে পারে নি। কংগ্রেসের আসনের হেরফের হয় নি। সেন্টার ফর দি স্টাডি অফ সোশ্যাল সায়েন্স-এর হিসেব অনুযায়ী সদ্য-ভোটাধিকার-প্রাপ্ত নব্য যুবকযুবতীরা এবং ৫৯ বছরের বেশি বয়স্ক নারী-পুরুষরা এসপি-কে ভোট দিয়েছেন। এবং মুসলিম ভোটও ২০০৯-এর সাধারণ নির্বাচনের পর আবার এসপি-র কাছে ফিরে এসেছে। কংগ্রেসকেও তারা এবারের নির্বাচনে বেশি করে সমর্থন জানিয়েছে। তবে এতে কংগ্রেসের ঘাটতি পূরণ হয় নি। এর পুরো লাভটা উঠিয়েছে এসপি।

নির্বাচনের পর নির্বাচনের উপর নানান আলোচনায় অনেকে বলেছেন, সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইনক্লুসিভ গ্রোথ-এর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব সেটার সমাধান ২০০৭-এর নির্বাচনের পর মায়াবতী করতে পারে নি। ২০০৭-এর পর থেকে পাঁচ বছরে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চ জাতির লোকেরা উত্তরপ্রদেশের সরকারে এবং আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরের নানান চাকরি নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছে। ঝাড়ুদারের চাকরি যেটা প্রায় সম্পূর্ণভাবে দলিতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল সেটা সব বর্ণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে; তার পুরো ফায়দা উঠিয়েছে তারা। ক্রমশই দলিতরা মনে করতে আরম্ভ করেছিল যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের স্থান সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। এর পর আছে সর্বস্তরে ভ্রষ্টাচারের অভিযোগ, যার থেকে মায়াবতী নিজেও মুক্ত ছিলেন না। এবং ক্রমশই দ্রুত গতিতে 'দলিত কা বেটি' দলিতদের থেকেই দূরে সরে গিয়েছে এবং এক ভ্রষ্ট এবং রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রের বেড়াজালে বেষ্টিত হয়ে পড়ছিলেন মায়াবতী। এ সবের ফলাফল ২০১২-র নির্বাচনে মায়াবতীর পরাজয়।

এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস বুঝতে পেরেছে শুধুমাত্র ফাঁকা বুলি দিয়ে নির্বাচন আর জেতা যাবে না। তার জন্য চাই তৃণমূল স্তরে দলের মজবুত সংগঠন এবং দায়িত্ববান রাজনৈতিক কর্মী। এই দুটোই তার কাছে নেই। সব থেকে শোচনীয় অবস্থা বিজেপি-র। বিএসপি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বাবুলাল খুসবাহাকে দলে নেওয়ার জন্য এবং উমা ভারতীকে নির্বাচনে দাঁড় করানোতে দলকর্মীদের মধ্যে দারুন অসন্তোষ এবং নেতাদের মধ্যে দলাদলি বিজেপি-র আসন সংখ্যাকে ৫১ থেকে ৪৭-এ নামিয়ে এনেছে।

যদিও সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ম্যানিফেস্টোতে এবং তাদের নেতারা প্রাক-নির্বাচন বক্তৃতাগুলিতে প্রগতির কথা এবং ভ্রষ্টাচার বিরোধের কথা বলেছে, কার্যত তারা যথারীতি জাতপাতের রাজনীতি অনুসরণ করেছে। বিজেপি-র উমা ভারতী- লোধ জাতির নেত্রী- মাহোবা জেলার লোধ প্রভাবান্বিত চারকারি নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচন লড়েছেন। আবার বিজেপিরই কট্টর ব্রাহ্মণ নেতা কালরাজ মিশ্র নিজের দেশ গাজিয়াবাদ ছেড়ে ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাচন জিতেছেন। ঐ দলেরই বরিষ্ঠ নেতা, জাতিতে কুর্মি, ওম প্রকাশ সিং, কুর্মিদের দুর্গ বলে কথিত মির্জাপুর জেলার চুনার নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান। কংগ্রেসের নামী কুর্মি নেতা বেনী প্রসাদ বর্মা তার পুত্র রাশ ভার্মার জন্য কুর্মিদের বরবনখী জেলা দরিয়াবাদ নির্বাচনক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের নেতা এবং পাহাড়ি ব্রাহ্মণ রিতা বহুগুণা তার ২০০৭-এর নির্বাচনক্ষেত্র এলাহাবাদ ক্যান্টনমেন্ট— যেখানে তিনি গতবার হেরে গিয়েছিলেন— ছেড়ে দিয়ে এবারে লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাচনে জিতেছেন। এই এলাকায় তার দেশের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। গত বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের নেতা শিবলাল যাদব ইটাওয়া জেলার যাদব প্রভাবান্বিত জওয়ান্তনগর নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নির্বাচন জিতেছেন। এসপি-র প্রথম শ্রেণীর মুসলমান নেতা আজম খান মুসলিম-প্রধান রামপুর নির্বাচনক্ষেত্র থেকে এবার নির্বাচন জিতেছেন। ১৯৭৭ এবং ১৯৯৬-এ আজম খান রামগড় থেকে পরাজিত হয়েছিলেন। তবুও তিনি রামগড়বাসী মুসলিমদের ওপর আস্থা হারান নি। জাঠদের নেতা অজিত সিং-পুত্র জয়ন্ত চৌধুরী মথুরা জেলার জাঠেদেরই নিজস্ব ক্ষেত্রে থেকে

সারণী ২

ক্রোড়পতি রাজনীতিকের সংখ্যা

দল	মোট বিধায়ক	ক্রোড়পতি	(%)
এসপি	২২৪	১১৮	(৬২.৫)
বিএসপি	৮০	৬৩	(৭৮.৮)
বিজেপি	৪৭	৩২	(৬৮.১)
কংগ্রেস	২৮	১৮	(৬৪.৩)
রালডি	৯	৭	(৭৭.৮)
স্বতন্ত্র	৬	৪	(৬৬.৩)
মোট	৪০৩	১৭১	(৬৭.৩)

নির্বাচন জিতেছে। এই ধরনের উদাহরণ অনেক, সব দলের সব স্তরে। এই নির্বাচনে ৪০৩টি নির্বাচনক্ষেত্রে ২২৩টি দলের ৪৮৩৯টি উমেদারদের সবাই উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনে জেতার জাতপাতের চিরাচরিত পথটি অনুসরণ করেছেন। স্বজাতির কাছে তাদের প্রগতি কথা, ভ্রষ্টাচার বিরোধের কথা, গুন্ডাশাহী ধস্তের কথা সহজে বলা যায়।

এই সব বিধায়কদের অধিকাংশই ক্রোড়পতি। ইউপি ইলেকশন ওয়াচ-এর পরিসংখ্যান অন্তত তাই বলে। ২০১২ সালে নির্বাচিত বিধায়কদের ২৭১ জন (৬৭ শতাংশ) ক্রোড়পতি। ২০০৭ সালের বিধানসভায় ক্রোড়পতি ছিল ১২৪ জন (৩১ শতাংশ)। বড়ো দলগুলির মধ্যে এসপি-র গড় সম্পত্তির মূল্য ২.৫২ কোটি টাকা, বিএসপি-র ৪.৪৪ কোটি টাকা এবং কংগ্রেসের ৬.০১ কোটি টাকা। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের নবাব কাজিম খান যিনি সুয়ার নির্বাচনক্ষেত্র থেকে জিতেছেন, তিনি সবচেয়ে বেশি সম্পত্তির মালিক (৫৬.৮৯ কোটি টাকা)। তার পেছনে আছে মুবারকপুরের বিএসপি বিধায়ক শাহ আলম (৫৪.৪৪ কোটি টাকা), এবং তার পর নয়ডার বিজেপি বিধায়ক মহেশ কুমার শর্মা (৩৭.৪৫ কোটি টাকা)। এই পরিসংখ্যানে দেখা যায় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় কোটিপতিদেরই নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ২০১২ নির্বাচনে বিজয়ী বিধায়কদের ২৭ শতাংশ বিধায়কের সম্পত্তির মূল্য ৫ কোটি টাকা বা তার বেশি। অন্য দিকে যাদের সম্পত্তি ২০ লাখের নিচে তাদের মধ্যে মাত্র ১.২ শতাংশ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে আর্থিক ক্ষমতা এবং নির্বাচনে সফলতার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

এই ক্রোড়পতিদের মধ্যে অনেক অপরাধীও আছে। অনেকের অপরাধ গুরুতর। বর্তমান বিধানসভার ৪০৩ জন বিধায়কের মধ্যে ১৮৯ জনের (৪৭ শতাংশ) বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের মামলা রয়েছে। ৯৭ জনের (২৪ শতাংশ) অপরাধ গুরুতর। ২০০৭ বিধানসভায় অপরাধের মামলা রয়েছে এমন বিধায়কের সংখ্যা ছিল ১৪০ জন (শতকরা ৩৫ ভাগ), আর তার মধ্যে গুরুতর অপরাধের মামলা ছিল ৭৮ জনের বিরুদ্ধে (শতকরা ১৯ ভাগ)। দলগতভাবে এসপি-র মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা বেশি। ২২৪ জনের মধ্যে ১১১ (৪৯.৬ শতাংশ) সমাজবাদী পার্টি বিধায়ক ছোট বড়ো নানান ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত। তাদের মধ্যে ৫৬ জনের (২৫ শতাংশ) অপরাধ গুরুতর। বিএসপি-র ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৮৮ (৮০ শতাংশ) এবং ১৪ (১৭.৫ শতাংশ)। বিজেপি-র ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪৭ (২৫ শতাংশ) এবং ১৪ (২৯ শতাংশ)। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ২৮ (১৩ শতাংশ) এবং ৯ (২৫ শতাংশ)।

উত্তরপ্রদেশের যুবক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের সামনে সমস্যা তাই অনেক। নির্বাচনের অনেকদিন আগে থেকে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছাত্রদের ল্যাপটপ এবং বেকার যুবকদের বেকার ভাতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বন্ধন অনেক। এক বেসরকারি হিসেবে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের ল্যাপটপ এবং বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়ার খরচ বছরে ৩৫০০০ কোটি টাকার বেশি। এ দিকে রাজকোষ প্রায় শূন্য। কিন্তু অখিলেশের আরও কঠিন সমস্যা হচ্ছে কাঠামোগত— বিশেষ করে সামাজিক ও রাজনৈতিক। এর একটা রূপরেখা ওপরে দেওয়া হয়েছে। শ্রেণী চরিত্রের একটা দিক উল্লেখ করে এর উপসংহার করা অনুচিত হবে না। সমাজবাদী পার্টিতে যাদের আধিপত্য- সেই যাদব, কুর্মি, কোয়েরি, ধনী মুসলিম ইত্যাদি এবং বর্তমানে কিছু সবর্ণ - তারা প্রধানত জমিদার, সশস্ত্র, স্বভাবত হিংস্র। অন্যদিকে অসংখ্য গরিব মুসলমান কারিগর-শিল্পী, দলিত ও অতি-দলিত, যারা ভোটদাতাদের অধিকাংশ, যারা এখনও বিএসপি-র প্রধান সমর্থক কিন্তু যাদের কিছু অংশ এবারে এসপি সমর্থক, সেই অসংখ্য দরিদ্রের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার কিছু বুনিয়াদী দাবি আছে। সমাজবাদী পার্টির যারা প্রধান সমর্থক সেই জাতির (এবং শ্রেণীর) কাছে এই সব দাবি নেহাতই আনুসঙ্গিক। মুখে স্বীকার না করলেও এইটাই এই প্রদেশের একটা বড়ো দ্বন্দ্ব। বিদেশে উচ্চশিক্ষিত যুবক মুখ্যমন্ত্রী কী ভাবে এই কঠিন দ্বন্দ্বের সমাধান করেন সেটাই দেখার বিষয়।

সারণী ৩

দলগত অপরাধীদের সৰংখ্যা: ২০১২

	বিধায়ক সংখ্যা	অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বিধায়ক		গভীর অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বিধায়ক	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
এসপি	২২৪	১১১	৪৯.৬	২৬	২৫.০
বিএসপি	৮০	২৯	৩৬.৩	১৪	১৭.৫
বিজেপি	৪৭	২৫	৫৩.২	১৪	২৯.৮
কংগ্রেস	২৮	১৩	৪৬.৩	৯	২৫
মোট	৪০৩	১৮৯	৪৬.৯	৯৮	২৪.৩

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও 'দলতন্ত্র'

সমরেশ মিত্র

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দলতন্ত্র'-র বদলা হিসেবে বদলের যে বাসন্তী হাওয়ায় এখন বাঙালির মন উচাটন, সেই হাওয়া এখন পরবর্তী যৌক্তিক রাস্তা ধরে অন্যান্য বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিপন্ন করে তুলেছে। এমনই এক ভৈরবী-তাণ্ডবের রণক্ষেত্র হওয়ার হাত থেকে অল্পের জন্য রেহাই পেয়ে গেল শতাব্দী-প্রাচীন মান্য বিদ্যা প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। একথা বিদ্বৎ সমাজে সুবিদিত যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার, তার পুঁথি সহ অন্যান্য পত্রপত্রিকার সংগ্রহ সম্ভবত সারা এশিয়াতেই বিরল। বহু ক্ষেত্রেই প্রাচীন সাহিত্য, সামাজিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণার একমাত্র আকর গ্রন্থ এবং মূল নথিপত্রর প্রায় একমাত্র সংগ্রহ এই অমূল্য গ্রন্থাগারের চমকপ্রদ বৌদ্ধিক সম্পদ।

কিন্তু কমলকাননে মত্ত হস্তীর তাণ্ডব বিরল নয়। এমনই এক সাম্প্রতিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার এবং তৎসংলগ্ন এলাকা। 'উচ্ছেদ' ও 'দখলদারি'র বিরুদ্ধে সরব, যে দলতন্ত্র-বিরোধী শক্তি গত ১০ মাসে সমস্ত নির্বাচিত সংস্থা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদচ্যুত করে মনোনীত গণতান্ত্রিক দলতন্ত্রের প্রতিভূবৃন্দকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত একদল 'সংস্কৃতিপ্রেমী' এই মান্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠানটির দখল নিতে উদ্যত হয়। পুলিশের তৎপরতায় (জনশ্রুতি, জনৈক সমাজবিরোধী ব্যক্তিকে গুপ্তি হাতে 'দখল'-এর নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় এবং 'আত্মগোপনকারী' এই ব্যক্তিকে নিরস্ত করার স্থানীয় দাবিতে পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে) সেদিন রক্তাক্ত ঘটনার হাত থেকে রামেন্দ্রসুন্দর-রাজেন্দ্রলাল মিত্রদের এই প্রাচীন সংস্থাটি রক্ষা পায়।

প্রবাদ আছে, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে তহবিল তছরূপ, চরিত্র স্খলন ও বেনিয়মি কাজের ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রচার সব চেয়ে কার্যকর হয়। সহসা দেখা গেল দামি ফ্রেক্সে ছাপা একটি প্রচারপত্রে সারা উত্তর কোলকাতা ছেয়ে গেছে। প্রচারপত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল কেমনভাবে বর্তমান কার্যসমিতি পরিষদের তহবিল অসৎভাবে ব্যবহার করছে এবং পরিষদের বৌদ্ধিক সমাজ বেআইনিভাবে বিদেশে পাচার করছে।

পরিবর্তনের নির্মল বাতাসে যখন এই কলকাতা শহর হিল্লোলিত, তেমনই এক ব্রাহ্মমুহূর্তে পরিবর্তিত সরকারের গন্ডা দুয়েক সরকারি দপ্তরে পরিষদের বর্তমান সম্পাদক এবং অন্যান্য কিছু আধিকারিকের নামে নানান 'অভিযোগ' সহ কয়েক গন্ডা চিঠি জমা পড়ে। ঠিকই ধরেছেন, সব কটি চিঠিই বেনামি চিঠি। উড়ো চিঠি বেশির ভাগই সাধারণভাবে উড়ো এবং কাল্পনিক অভিযোগে ভরপুর থাকে। দু-একটা অভিযোগ শোনা যাক। যেমন, পরিষদের বর্তমান কার্যকরী সভা রাশি রাশি বেআইনি কাজ করছে, পরিষদের অছি পরিষদের সদস্য, বর্তমান অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় যে টাকা পরিষদকে দিয়েছেন (কিছু জ্ঞানচর্চা সম্পর্কিত শর্তাধীনে), সেই টাকার সুদে নাকি বর্তমানের কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিক 'ক্যাডার বাহিনী' পোষেন, বিদেশে বই পাচার চক্রের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ বই নাকি নিয়মিত বিদেশে বেআইনিভাবে চালান দেওয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব অভিযোগ এমনই স্তরের যে এসবের ভিত্তিতে পুলিশ দেওয়ানি মামলার ভিত্তিতে 'অভিযুক্ত'বৃন্দকে আইন মোতাবেক গ্রেপ্তার করতে পারে। আইনি পথে তদন্তের প্রথম ধাপ হলো অভিযুক্তকে অভিযোগপত্র দেওয়া কিন্তু সেই আইনি কাজটি লেখাটি প্রেসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি।

ঘটনা হলো, উড়ো চিঠির এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত গতিতে খান কয়েক সরকারি তদন্তকারী দল, বার দুয়েক কোনও ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ দফায় দফায় তদন্ত করে যায় এবং যে 'অভিযোগ'-এর ভিত্তিতে এমন অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তদন্ত সংঘটিত হলো, সাহিত্য পরিষদের আধিকারিকদের কিন্তু সেই 'অভিযোগপত্র' সরকারিভাবে দেওয়া হয়নি। (আইনমতে, অভিযোগপত্র না দিয়ে পুলিশি বা সরকারি তদন্ত বেআইনি)।

ঘটনা হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমস্ত নথিপত্র ও অন্যান্য কাগজ পরীক্ষা করে পরিবর্তনপন্থী সরকারের নিযুক্ত বিশেষ অডিট দল পরিষদের বই সংরক্ষণ, চিত্রশালার কাজগুলি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে রিপোর্ট দিয়ে গেছেন!

পরিষদের অমূল্য সম্পদ পুস্তকাদির স্টক পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে গত কয়েক বছর হলো। কেন টেন্ডার ডেকে এই কাজ করা হয়নি সে বিষয়েও উড়ো চিঠিতে এবং পরিষদের বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত নন এমন কয়েকজন পরিবর্তনপন্থী ব্যক্তি অভিযোগ তোলেন। ঘটনা হলো, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত এই সমস্ত কর্মীদের রীতিমতো ইন্টারভিউ নিয়ে নিযুক্ত করা হয়েছে। যে তালিকা থেকে প্রার্থী বাছাই করে ইন্টারভিউ হয় সেই তালিকা সরবরাহ করেছিল বঙ্গীয় লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ডিগ্রিধারীরা এই তালিকায় ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে থেকেই কর্মীবৃন্দকে নির্বাচন করা হয়েছে। স্বভাবতই সেই তালিকাতে বিধায়ক, সাংসদ বা তাঁদের দেহরক্ষীদের নাম ছিল না।

অভিযোগের সত্যতা আইনত প্রমাণের রাস্তা যখন বন্ধ হয়ে

গেল, সেখানে সেই চিরাচরিত সরকারি আর্থিক অনুদান সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার পীড়নমূলক পথটি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ সরকারের জাতীয়তা-বিরোধী নীতির প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা যে সমস্ত মান্য বিদ্যাচর্চা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, এই পরিষদটি তার অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বিদ্বৎজনবৃন্দ এই বিদ্যাচর্চা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছেন। একটি অছি পরিষদ এই বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রটির যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। প্রোমোটাররা যেমন গুন্ডা লাগিয়ে বাড়ির মালিককে বাড়ি-ছাড়া করে স্থানীয় গুন্ডাদের সহায়তায় বাড়ির দখল নিয়ে সেখানে শপিং মল বানায়, সেই আদিম কায়দায় এখন একদল দুর্বৃত্ত এখন পরিষদ দখল করতে উদ্যত হয়েছে। তারা যদি সফল হয় তবে অচিরেই বিদ্যাচর্চার এই পীঠস্থানটি বেদখল হয়ে যাবে। আশার কথা, গবেষক এবং পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থাগারের এমন দুর্দশার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং আসন্ন কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় তাঁরা একজোট হয়ে প্রার্থী তালিকা প্রদান করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এ প্রতিষ্ঠানটির যে কাজ, তার অনেকটাই সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হচ্ছে। ব্রজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় যে অসাধারণ গ্রন্থমালা (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) প্রকাশিত হচ্ছিল, তার ২৩টি খণ্ডর প্রতিটিই পাওয়া যাচ্ছে। পরিষৎ সংগ্রহশালার শতবর্ষ গ্যালারির উদ্বোধন হয়েছে। সাহিত্যিক স্মারক কক্ষও এখন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। আলোচনা সভা, বক্তৃতামালার নিয়মিত আয়োজন চলছে। পাঠক এবং গবেষকবৃন্দ এই সমস্ত কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ নেন। জ্ঞানচর্চার জগতে ইংরেজদের অবাঞ্ছিত এবং অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীরা একজোট হয়ে তাঁদের সম্পত্তি এই মান্য সংস্থাটিকে দান করে তাকে আর্থিক দিক থেকে যথাসম্ভব স্বয়ংভর করেছিলেন। স্বাধীনতার পর এটাই অভিপ্রেত ছিল যে স্বাধীন দেশের সরকার এই কেন্দ্রটিকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে সংস্থার কাজটির প্রসারণ ঘটানোর কাজে সদর্থক ভূমিকা নেবে। কর্মীদের মাসমাইনে এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকারি অনুদান মেলে অনেক টালবাহানার পর। কিন্তু উড়ো চিঠির ওপর ভিত্তি করে এবং যথানিয়মে তদন্ত না করেই বর্তমানে সরকার কর্মীদের মাইনে বাবদ অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে।

এমন এক পরিকল্পিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পরিষদকে সরকারি আওতায় আনার যে নেপথ্য অভিযান শুরু হয়েছে, তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে না পারলে অচিরেই অঙ্কুরটি বিষবৃক্ষের জন্ম দেবে। সব দিক থেকেই আজ দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন। এখন বিশ্বায়নের থাবা সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে উদ্যত। পরিবর্তনপন্থীদের পরিবর্তনের পথ বিশ্বায়নের সেই নখরযুক্ত থাবার অধিকারীদের অনুসারী। বিদ্যাচর্চা জ্ঞানচর্চার জগতে ফের শুরু হোক স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই। সাহিত্য পরিষদকে তার মান্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার আসন অটল রাখার লড়াইয়ে পাঠক ও গবেষক সমাজের এই উদ্যোগ স্বাগত। দেখা যাক, অসি ও মসির সংগ্রামে কে জেতে!

রাস্তা তুমি কার?

বড়লোকদের জন্য উড়ালপুর, চওড়া রাস্তা আর গরীবদের সাইকেল চালানো বেআইনি! নোনাডাঙ্গার ঘটনা শহরের উচ্ছেদ-এর বিষয়টি আবারও সামনে আনলো। সম্প্রতি 'সাইকেল সমাজ' নামের একটি নাগরিক উদ্যোগ পরিবেশ সচেতনতার দৃষ্টিকোণ থেকে সাইকেলকে স্বল্প দূরত্বের পরিবহন হিসেবে উপস্থাপিত করতে চাইলেন। তাঁদের প্রচারিত এক প্রচারপত্রের অংশ :

> একের পর এক রাস্তায় সাইকেল নিষিদ্ধ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৩৮টিরও বেশি রাস্তায় সাইকেল নিষিদ্ধ আর রবারস্ট্যাম্প দেওয়া বেআইনি রসিদের মাধ্যমে পুলিশ ১২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করছে। এই জরিমানার শিকার হচ্ছেন হকার, কাগজওয়ালা, দুধ বিক্রেতা ইত্যাদি। ইউরোপ বা এশিয়ান দেশগুলি যখন বড়ো শহরে দূষণ কমাতে সাইকেলকে উৎসাহ দিচ্ছে, তখন কলকাতা উল্টো পথে হেঁটে দূষণহীন সবচেয়ে কম জায়গা নেওয়া সস্তার বাহন তুলে দেওয়ার আয়োজন করেছে। সাইকেলের ব্যবহার বাড়লে যানজট এবং দূষণ, দুই-ই কমবে— সারা পৃথিবীর অভিজ্ঞতাও তাই।

সাইকেল আরোহী এই পরিবেশ-সচেতন নাগরিকবৃন্দ প্রশ্ন তুলেছেন "সাইকেল চালাই, তাতে কার ক্ষতি?"

প্রবন্ধ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইতিহাস ও দু' দশকের কৃষি কর্মকাণ্ড

শুভ্রকেতন বসু

তৃতীয় বিশ্বের কৃষিজ সম্পদ লুণ্ঠনের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। কালে কালে তার কৌশল পাল্টেছে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের আদি যুগে যখন অধুনা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি হয় রাজতন্ত্র অথবা গোষ্ঠী-শাসনের অধীন ছিল তখন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে, বিশ্বাসঘাতক তৈরি করে, নানান কলা-কৌশল করে, উপনিবেশ দখল করাই ছিল দস্তুর। দখল করা দেশে জোর করে খাদ্যশস্যের চাষ বন্ধ করে নীল, চা, আফিং, কফি, কোকো, কলা, রবার চাষ হতো। খাদ্যশস্য যা উৎপন্ন হতো তারও একটা বড় অংশ মাঝে মাঝে চলে যেত সৈন্যবাহিনীর রসদ হিসাবে, যাতে যুদ্ধ করে সাম্রাজ্য আরও বাড়ানো যায়। পদানত দেশগুলিতে নেমে আসত দুর্ভিক্ষ, আর ইউরোপে কাপড় রঙিন হতো, খাদ্য-পানীয় হতো আরও সুস্বাদু, আরও পুষ্টিকর। এই ভয়ঙ্কর শোযনের সময়েও কিন্তু বলা হত, এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার 'বর্বর'দের সভ্যতার আলো দেখাবার জন্যই শুধু শ্বেতাঙ্গরা এত কষ্ট করে সেসব দেশে পাড়ি জমিয়েছিল।

রুশ বিপ্লব সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের মনে জাগিয়েছিল মুক্তির এক অপূর্ব উন্মাদনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশগুলিতে মুক্তির আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। চীন বিপ্লব সারা পৃথিবীর সামনে সংগঠিত কৃষকের রাজনৈতিক আর সামরিক শক্তির প্রচণ্ডতা প্রতিষ্ঠা করলো। আর ভিয়েতনামে কৃষক গেরিলাদের হাতে বেদম মার খেয়ে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বুঝলো কৌশলটা এবার পাল্টাতে হবে। ক্ষুধার্ত কৃষক তখন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিভীষিকা। তৃতীয় বিশ্বের দেশে তাই খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াবার পরিকল্পনা করা হলো। এলো সবুজ বিপ্লব। মার্কিন সামরিক সংস্থা পেন্টাগনের চাঁই ম্যাকনামারা ভিয়েতনামে লাল বিপ্লব ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৬৮ সালে পেন্টাগন ছেড়ে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদে যোগদান করলেন[১]; এবং তার এই নয়া অবতার সবুজ বিপ্লবের এক উৎসাহী কর্মকর্তা হিসাবে অবতীর্ণ হল।

সবুজ বিপ্লব ছিল এমন এক প্রযুক্তি যাতে চাষি বিভিন্ন কৃষি-রাসায়নিক এবং যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর বিস্ফোরক আর রাসায়নিক অস্ত্র বানাবার যে কোম্পানিগুলি নিদারুণ সংকটে পড়েছিল তারা সার আর কীটনাশক বেচে লাল হয়ে গেল। বিস্ফোরক আর রাসায়নিক অস্ত্র বানাবার কায়দাটা একটু পাল্টে নিলেই দিব্যি সার আর কীটনাশক বানানো যায়। অনেক রাসায়নিক উৎপাদক বহুজাতিক কোম্পানি বীজ ব্যবসায় ঢুকলো। সবুজ বিপ্লবের ভুল পরিকল্পনায় বহু আশ্চর্য গুণসম্পন্ন দেশীয় শস্যের বীজ যেমন দেশ থেকে অবলুপ্ত হতে থাকলো, বীজের বাজারে ততই জাঁকিয়ে বসলো এই কোম্পানিগুলি। সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি খাদ্য উৎপাদন কতটা বাড়িয়েছিল তা যথেষ্ট বিতর্কিত। বহু গবেষণায় প্রমাণিত, খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য এই প্রযুক্তি অপরিহার্যও ছিল না।[২,৩] কিন্তু এটা কৃষিজমি, জনস্বাস্থ্য আর পরিবেশের সন্দেহাতীত ক্ষতি করেছে।[৪] আজ ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ কৃষিজমি অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে রুগ্ন।[৫] দেশের খাদ্য উৎপাদন ক্রমশই বিদেশ থেকে আমদানি করা রাসায়নিক আর বীজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সবুজ বিপ্লবের পর আমলাশোল, কালাহাণ্ডি, শিবপুরি ইত্যাদি অনেক জায়গায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। মাথা-পিছু খাদ্য উৎপাদন আহামরি কিছু বাড়েনি বরং ডাল-শস্যের মাথাপিছু উৎপাদন অর্ধেক হয়ে গেছে। ভারতীয় শিশুদের অপুষ্টির মাত্রা সাহারা মরুভূমির কাছাকাছি আফ্রিকার সবচেয়ে গরীব দেশগুলোকে লজ্জা দেবে।[৬] অথচ সবুজ বিপ্লব ভারতকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করেছিল বলে নির্লজ্জ ঢাক পেটানো এতটুকু কমেনি।

ইতিমধ্যে বিশ্বের বাতাসে অনেক কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট নামধারী আমলাতান্ত্রিক শাসকেরা ধরাশায়ী হয়েছে। চীনে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়ে পুঁজিবাদের বেহায়া অনুশীলন চলছে। বিশ্ব জুড়ে নির্যাতিত মানুষের আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত দিশাহারা। বিশ্ব পুঁজিবাদের এইরকম সুখের সময়ে আর একটু ভালোরকম লুটপাটের ব্যবস্থা করলে (অবশ্যই একটা মানবিক মুখোশের আড়ালে) মন্দ হয় না। তাই গ্যাট (GATT) বদলে গেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডবলিউটিও (WTO)-তে। এবং WTO-তে কৃষি অন্তর্ভুক্ত হল। সূচনা হল সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের এক নয়া অধ্যায়ের। ঔপনিবেশিক শোষণের ইতিহাস বিস্মৃত হলে WTO-র নয়া কলাকৌশলগুলির সম্পর্কে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হতে পারে তাই এই শিবের গীতটুকু গাওয়া হল।

গ্যাট থেকে WTO

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী দেশগুলি তিনটি অর্থনৈতিক সংস্থা বানাবার উদ্যোগ নেয়। এগুলি হল বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IMF) এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ITO)। নয়া উদারনীতিবাদী অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত এই সংস্থাগুলির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বাধার অর্থনৈতিক কারণগুলি প্রশমিত করা।[৭] বিশ্বব্যাংক এবং IMF নিয়ে আপত্তি না থাকলেও মার্কিন কংগ্রেস ITO নিয়ে আপত্তি জানায়। তাদের আপত্তির মূল কারণ ছিল এই

আন্তর্জাতিক সংস্থাটির নিয়মকানুন নাকি অতিরিক্ত মাত্রায় সার্বভৌম।[৭] মার্কিন কংগ্রেসের আপত্তিতেই ITO শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় না। বিশ্বব্যাঙ্ক ও IMF-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণে কুক্ষিগত করতে পেরেছিল, তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ITO-র ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হত না বলেই তাদের এত আপত্তি। যাইহোক, ITO-র বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের জন্য একটি ঢিলেঢালা মঞ্চ হিসাবে গ্যাট (GATT: General Agreement on Tariff and Trade)-এর আবির্ভাব হয়। গ্যাট ছিল এমন এক মঞ্চ যেখানে বহুপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে কোনো দেশের বাণিজ্যশুল্ক ঠিক হতো। গ্যাট প্রথম থেকেই আমদানি শুল্ক কমানো এবং বিভিন্ন দেশে অবাধ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কমানোর চেষ্টা করেছে। গ্যাট-এর অষ্টম রাউন্ডের (উরুগুয়ে রাউন্ড ১৯৮৬-৯৪) আলোচনায় প্রথম কৃষি অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৮৪ সালে গ্যাট-এ কৃষি সংক্রান্ত তিনটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। যেমন—Agreement on Agriculture (AOA). Agreement on application of Sanitary and phytosanitary Measures (SPS) এবং Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT)। এছাড়াও বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত চুক্তি (TRIPS) এই সময়ই অন্তর্ভূক্ত হয়।[৮] অষ্টম রাউন্ডের আলোচনার শেষে ১৯৯৫ সালে গ্যাট পরিণত হয় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা WTO-তে।[৭] এই পরিবর্তন নিছক নামের পরিবর্তন নয়। AOA. SPS. TBT. TRIPS প্রভৃতি চুক্তিগুলির সাহায্যে WTO তার সদস্য দেশগুলির উপর কৃষি ভর্তুকি, মেধাস্বত্ব ও পেটেন্ট এবং খাদ্যের গুণমান বিষয়ক এমন কিছু নিয়ম লাগু করতে চায় যা আগে একান্তভাবেই কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল। এইভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক নয়া যুগের সূত্রপাত হল। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনসমূহ হচ্ছে তার ফলাফল সম্যক উপলব্ধি করতে গেলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা জানা প্রয়োজন। এই বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পশ্চাৎপটে ভারতের সমস্যাগুলি আলোচিত হল।

WTO-উত্তর যুগে কৃষিতে পরিবর্তন

চুক্তি মোতাবেক বিশ্ব কৃষি অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়:

১) আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ হ্রাসের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ;

২) প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের উন্নয়ন এবং বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক সকল ভর্তুকির ধাপে ধাপে বিলোপ সাধন;

৩) কৃষিক্ষেত্রে পেটেন্ট অথবা সুই জেনারিস সিস্টেমের মাধ্যমে উন্নত জাতের উদ্ভিদ, প্রাণী বা অনু-জীবের উপর তার উদ্ভাবকের অধিকার সুরক্ষিত করা;

৪) কৃষিপণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট গুণমান (SPS) বজায় রাখা;

এই সকল পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশের তথা সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন এসেছে, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির খাদ্য নিরাপত্তা কতটুকু বজায় থাকছে তা আলোচনা করা হলো।

কৃষির আমদানি-রপ্তানির অবাধ সম্প্রসারণ

গ্যাট-এর উরুগুয়ে রাউন্ডে কৃষিপণ্য আমদানি-রপ্তানির বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ার মার্কিন প্রস্তাবটি রচনা করেছিলেন কার্গিল কোম্পানির প্রাক্তর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট।[৮] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট দানাশস্য রপ্তানির ৫০ শতাংশই করে কার্গিল এবং কন্টিনেন্টাল এই দুই কোম্পানি। খাদ্যশস্য আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক উঠে গেলে স্পষ্টতই এদের লাভ।

আমেরিকা কিন্তু ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত কৃষিপণ্যের অবাধ আমদানি-রপ্তানির বিরোধী ছিল। গ্যাট-এর সপ্তম রাউন্ড পর্যন্ত তারা কৃষিকে গ্যাট-এর অন্তর্ভুক্ত করতে চায়নি। ১৯৩৫ সালে Agricultural Adjustment Act সংশোধিত করে তারা বরং কৃষিপণ্যের আমদানির উপর বিধিনিষেধই আরোপ করে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের থেকে বেশি ছিল এবং মার্কিন চাষিদের স্বার্থ সুরক্ষিত ছিল।[৮] বিপুল ভর্তুকি-পুষ্ট বড় বড় মার্কিন খামার-মালিকরা প্রচুর বিদ্যুৎ, খনিজ তেল খরচ করে, বড় বড় কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে খাদ্যের উৎপাদন অনেক গুণ বাড়াতে সক্ষম হয়। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু খাদ্যে স্বয়ম্ভরই হয় না, অভ্যন্তরীণ চাহিদার থেকে অনেক বেশি খাদ্য তৈরী করতে শুরু করে। এই উদ্বৃত্ত খাদ্য রপ্তানি শুরু হয়। সমুদ্রপাড়ের অন্যান্য দেশে Public Law 480 (PL480) প্রকল্পে খাদ্য সহায়তার নামে এই উদ্বৃত্ত পাঠানো শুরু হয়।[৮] এই সময় তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই খাদ্যের ব্যাপারে মার্কিন মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। ভারতকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে সবুজ বিপ্লব গ্রহণ না করলে PL480-এর সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে।[৯] ১৯৫০-এর দশকে পৃথিবীর মোট গম রপ্তানির মাত্র ১০ শতাংশ যেত তৃতীয় বিশ্বে। ১৯৮০-র দশকে সেটা বেড়ে দাঁড়ালো ৫৭ শতাংশে।[৮] খাদ্য যেহেতু মানুষের প্রথম প্রয়োজন তাই খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া কোনো দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে আবশ্যিক। যে দেশ খাদ্যের ব্যাপারে যত বেশি পরনির্ভরশীল তার সার্বভৌমত্বও তত ক্ষুণ্ণ হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য রপ্তানির মাধ্যমে নিজেকে এক 'সবুজ শক্তি' (Green Power) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেয়। ১৯৭৩ সালে Farm Bill পাসের মাধ্যমে মার্কিন চাষিদের রপ্তানির জন্য খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হয়।[৮] মার্কিন কৃষিজমির কেন্দ্রীভবন এবং রপ্তানিতে বৃহৎ পুঁজির আধিপত্য বাড়তে থাকে। ইউরোপের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলো এবং জাপান কৃষি প্রশ্নে মার্কিন মডেল অনুসরণ করতে শুরু করে। কৃষিপণ্যের বাজার দখলের

জন্য ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রতিযোগিতা তীব্র হয়। ১৯৮০-র দশকে বিশ্ববাজারে গম, অন্যান্য দানাশস্য এবং কিছু বিশেষ প্রাণীজ দ্রব্য রপ্তানির প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য আমেরিকায় Export Enhancement Programme বা EEP (রপ্তানি সম্প্রসারণ প্রকল্প)-র মাধ্যমে রপ্তানিতে ভর্তুকি দেওয়া হয়। আমেরিকার সাধারণ মানুষের করের টাকা থেকে তোলা এই বিপুল কৃষি ভর্তুকি অবশ্য সে দেশের মুষ্টিমেয় কিছু অতিবৃহৎ খামার মালিক আর কোম্পানির পকেটে যায়। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার উৎপাদিত মোট ফসলের ৫০ শতাংশই আসতো মাত্র ২ শতাংশ খামার থেকে। মার্কিন নাগরিকেরা যে খাবার খায় তা ৯৫ শতাংশই তৈরি ও/বা বিক্রি করে বৃহৎ কোম্পানি (যেমন Phillip Mosser বা Con Agra ইত্যাদি)।[৮] এই ব্যবস্থা কিন্তু মার্কিন সমাজকে বুভুক্ষা মুক্ত করতে পারেনি। আজও প্রায় ৩ কোটি আমেরিকান ক্ষুধার্ত থাকতে বাধ্য হন।[৮] অথত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর রপ্তানিকৃত মোট গমের ৩৬% বালি, ভুট্টা, জোয়ার আর ওটের ৬৪% সয়াবীনের ৪০% চালের ১৭% এবং তুলোর ৩৩% রপ্তানি করে।[৮] ১৯৯০ সালে আমেরিকার কৃষি সংস্থা (USDA) হিসাব করেছিল যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়ায় ২০০০ সালের মধ্যে ২ বিলিয়ন (দুশো কোটি) ডলার মূল্যের কৃষিপণ্য রপ্তানি করা সম্ভব।[৮] তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এই বাজার যথেষ্ট বড়। এই বাজার ধরার জন্য মার্কিন সহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের দানবীয় কোম্পানিগুলি যে ঝাঁপাবে তাতে আর আশ্চর্য কী! খাদ্য রপ্তানির যে ব্যবস্থা এইভাবে ধাপে ধাপে বিশ্বায়িত হয়েছে তার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করার জন্য গ্যাট-এর অষ্টম রাউন্ডে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তুলে দেবার প্রস্তাব হয়। এক-মেরু বিশ্বে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়। গ্যাট বদলে যায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা WTO-তে। মার্কিন এবং অন্য কয়েকটি শক্তিধর দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অবস্থা হল মর্মান্তিক। ভর্তুকিপুষ্ট ও শুল্কবাহিত সস্তা খাদ্যশস্য ঢোকার ফলে প্রথমে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের দাম পড়ে গেল। তৃতীয় বিশ্বের চাষিরা পড়লো ঘোর সংকটে। যেমন মেক্সিকোতে সস্তায় ভুট্টা আমদানি করার ফলে ভুট্টার বাজারদর এতো নেমে গিয়েছিল যে ভুট্টা চাষের উপর নির্ভরশীল ৭-৮ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা ভীষণ বিপর্যস্ত হয়।[১০] আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করার ফলে ২০০০ সালে ফিলিপাইনস্-এর খাদ্যশস্যের দাম ২০ শতাংশ কমে যায়। যার ফলে ৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের জীবনে সংকট ঘনিয়ে আসে।[১১] তাদের রোজগার ১৫% কমে যায়। পরিণতিতে সে দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি পায়, অপুষ্টি ও অশিক্ষার হার বাড়ে। ১৯৮৬ পর্যন্ত কেনিয়া খাদ্যে স্বয়ম্ভর ছিল। WTO-উত্তর যুগে ৮০% খাদ্যই আমদানি করে, অথচ কেনিয়ার মোট রপ্তানির ৮০%ই কৃষিজ পণ্য। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে প্রচুর ভর্তুকি দেওয়া খাদ্যশস্য ঢোকার ফলে কেনিয়ার গমের দাম এত কমে যায় যে ১৯৯৫ সালের মধ্যেই গোটা খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, যা গ্রামীণ দারিদ্র্যকে তীব্র করেছিল।[১২] ভারতেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে, সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করবো। এই অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের চাষিকে শতাব্দী প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী সদুপদেশ দেওয়া হল: খাদ্যশস্যের চাষ বন্ধ ক'রে রসালো ফল পুষ্টিকর সব্জি রঙিন ফুল চাষ করো। মাছ-মাংস চাষ করো। রপ্তানী এখন অবাধ। এই সব অতিমূল্যবান কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করো প্রথম বিশ্বে। সেখানে এর প্রচুর চাহিদা। এইভাবে তৃতীয় বিশ্বের চাষিকে আয় বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হলো। এই জাতীয় পরামর্শ শুনলে কী হতে পারে জানার জন্য তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশের ১৯৮০-র দশকের অভিজ্ঞতা আলোচনা করা যাক।

মরক্কোকে একসময় বলা হত উত্তর আফ্রিকার শস্য ভাণ্ডার। রপ্তানিমুখী কৃষিনীতি গ্রহণ করার পর সে দেশে ব্যাপকভাবে টমেটো কমলালেবুর চাষ শুরু হল। ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন এত কমে গেল যে ১৯৭০ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে তাদের খাদ্য আমদানি ২২০% বাড়াতে হয়েছিল।[১৩] অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে হঠাৎ চাহিদা পড়ে যাওয়ায় তাদের লক্ষ লক্ষ টন টমেটো আর কমলালেবু শস্যক্ষেত্রে বা বন্দরে পচে নষ্ট হয়েছে।[১৩] দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে যাওয়া আর আন্তর্জাতিক বাজারে দামী কৃষিজ পণ্য রপ্তানি না করতে পারার কারণে তাদের দেশে বেকারি দারিদ্র্য বুভুক্ষা প্রচুর বেড়েছিল।[১৩] একই ঘটনা ঘটেছিল তানজানিয়ায়। সেখানে খাদ্যশস্য চাষ বন্ধ করে রপ্তানির জন্য তুলোচাষ করা শুরু হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে ভালো বৃষ্টি হওয়ায় প্রচুর তুলোর ফলন হয়। চাষিরা ভালো লাভের আশা করেছিল। কিন্তু ফাটকাবাজির খেলায় সে বছর জুলাইতে এক রাতের মধ্যে প্রতি পাউন্ড তুলোর দাম আন্তর্জাতিক বাজারে ৬৮ সেন্ট থেকে নেমে ৩৪ সেন্ট হয়ে যায়।[১৩] পরিণাম সেই একই: দারিদ্র্য বেকারি বুভুক্ষা। মেক্সিকোর অভিজ্ঞতাও কিছু অন্যরকম নয়। তারা রপ্তানির জন্য গোমাংস উৎপাদন করতো। ১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৮৬ সালে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিগুণ গরু রপ্তানি করে। তবে তাতে লাভ দ্বিগুণ হয়নি। কারণ ১৯৮৬ সালে একতরফাভাবে গরু পিছু ১০০ ডলার দাম কম দেওয়া হয়েছিল।[১৩] মেক্সিকোতে যেহেতু গোমাংসের অভ্যন্তরীণ বাজার সীমিত তাই এই অন্যায় জুলুম বরদাস্ত করতে হয়েছিল। এই অসম বাণিজ্যে মেক্সিকোর অর্থনীতিতে ধ্বস নামে। সাহারা সন্নিহিত আফ্রিকার দেশগুলিতে একইরকম ঘটনা ঘটেছে। একই অভিজ্ঞতা থাইল্যান্ড বা বলিভিয়ারও।

তবে এগুলি সবই WTO পূর্ববর্তী ঘটনা। ৮০-র দশক ধরে এই ধরনের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই WTO-তে কৃষিজ পণ্যের অবাধ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এবং WTO চুক্তির

পরেও যথারীতি একই ঘটনা ঘটতে লাগলো। খাদ্যশস্য চাষ কমিয়ে রপ্তানিযোগ্য ফসল চাষ করার ফলে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ফিলিপাইনস খাদ্য আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়।[১৪] ২০০৪ সালে সে দেশে চালের নিদারুণ সংকট দেখা দেয়। আমাদের প্রতিবেশী বাঙলাদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বাংলাদেশের চিংড়ি স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট ভালো নয় এই অজুহাতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হঠাৎ আমদানী বন্ধ করে দেয়। এর ফলে বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্পের প্রায় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ক্ষতি হয়েছিল।[১৫]

WTO জমানায় ব্রাজিল ঢালাও রপ্তানি-মুখী কৃষির ব্যবস্থা করেছে। ২০০৭ সালে এই দেশটি মাংস, পোলট্রি জাত দ্রব্য, চিনি কফি এবং অরেঞ্জ জুস রপ্তানিতে বিশ্বে এক নম্বর ছিল।[১৬] সয়াবীন রপ্তানিতে ছিল দ্বিতীয়[১৬], ভুট্টা রপ্তানিতে ছিল তৃতীয় এবং শুয়োরের মাংস আর তুলো রপ্তানিতে ছিল চতুর্থ।[১৬] সে দেশের ৩৪০ মিলিয়ন হেক্টর কৃষিজমির মাত্র ৬৩ মিলিয়ন হেক্টর শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। আর ২০০ মিলিয়ন হেক্টর ব্যবহার করা হয় পশুচারণ ভূমি হিসাবে।[১৬] ব্রাজিলের প্রায় ৭৭ মিলিয়ন হেক্টর জলাভূমি ও জঙ্গলকে পশুচারণ ভূমিতে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে। ব্রাজিলের কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থায় Nestle, Unilever, Anderson, Cargill ইত্যাদি প্রায় ডজন খানেক দানবীয় বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্য রয়েছে।[১৬] ২০০৮ সালে ব্রাজিলে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি চোখে পড়ে। রুটির দাম এক বছরের মধ্যে ২০% বৃদ্ধি পায়।[১৭] ব্রাজিলকে মোট গমের ৭০% ই আমদানি করতে হচ্ছে, যাকে গত দু-দশকের সবচেয়ে বড় সঙ্কট বলে বর্ণনা করা হচ্ছে।[১৭]

এই পরিস্থিতিতে আমার আমাদের দেশে কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করবো। WTO-র নির্দেশ আমাদের দেশেও লাগু করা হচ্ছে। ভারতে কোনো দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে পরিমাণ সংক্রান্ত যে বিধিনিষেধ আছে তাকে বলা হয় Quantitative Restriction বা সংক্ষেপে QR। কোন বছর ভারতে কোনো পণ্য কী হারে আমদানি করা হবে বা আদৌ আমদানী করা হবে কিনা তা QR মারফত ঠিক করা হয়। ১৯৯০ সালের আগে ভারতে ৮০০০টি পণ্য QR নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯৭ সালে তা কমে দাঁড়ালো ২০০০টি পণ্যে।[১৮] ১৯৯৭ সালেই যুক্তরাষ্ট্র WTO-র বিবাদ মীমাংসা কমিটিতে এই মর্মে অভিযোগ করেছিল যে ভারত আমদানির ক্ষেত্রে QR-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ যথেষ্ট পরিমাণে অপসারিত করছে না। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে ভারতের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তাই ভারত ৩১ মার্চ ২০০৩-এর মধ্যে সমস্ত প্রধান প্রধান পণ্যের উপর QR তুলে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে ভারতে সয়াবিন ও সয়াবিনজাত তেল আমদানি অবাধ করা হয়। ফলস্বরূপ ভর্তুকি-পুষ্ট সস্তা সয়াবিন তেল ও অন্যান্য সয়াবিন-জাত পণ্যে দেশের বাজার ছেয়ে গেল।[১২] ১৯৯৯ সালে মোট আমদানিকৃত ভোজ্য তেলের পরিমাণ ছিল দেশের মোট চাহিদার ৪৫%।[১৯] এই সস্তা আমদানির ফলে দেশের তৈলবীজ উৎপাদন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষ লক্ষ ছোট তেলকল বন্ধ হয়ে যায়।[১২,১৯]

WTO জমানায় বৃহৎ বহুজাতিক পুঁজি ইতিমধ্যেই ভারতের মানুষের বুভুক্ষার বিনিময়ে মুনাফা করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং সার্বভৌম ভারত সরকার এই কাজে তাদের প্রত্যক্ষ মদত দিয়েছে। ২০০০-০১ সালে ভারতের সরকারি গুদামগুলোতে মোট ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য জমা হয়েছিল, যা দিয়ে অন্তত ৬০ কোটি মানুষকে ৬ মাস দুবেলা পেটভরে খাওয়ানো যায়।[২০] কিন্তু তা হল না। WTO শর্ত মেনে গণবণ্টন ব্যবস্থায় ভর্তুকি তুলে নেওয়ার ফলে খাদ্যশস্যের দাম বহু মানুষেরই নাগালের বাইরে চলে গেল। ভারত সরকার গুদাম খালি করার জন্য সস্তায় বিদেশে চাল-গম রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত নেয়। সাধারণ মানুষ যখন ১১ টাকা ৩০ পয়সা প্রতি কিলো দরে চাল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন তখন কারগিল এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের মত বহুজাতিক কোম্পানিকে রপ্তানির জন্য ভর্তুকি দিয়ে ৫ টাকা ৬৫ পয়সা কেজি দরে চাল দেওয়া হয়েছিল।[২১] আর সে সময় দেশে ৫০ কোটি মানুষ বুভূক্ষার শিকার হয়েছিল। এই কারগিল এখন সরাসরি কৃষিপণ্যের খুচরো ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে।

সম্প্রতি ভারতের কৃষিপণ্যের খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। অনেক বহুজাতিক কোম্পানি চাষিদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের পছন্দমত শস্য চাষ করাচ্ছে। কৃষিপণ্যের খুচরো ব্যবসায় যে কোম্পানিগুলি ঢুকছে তারা শুধু পণ্য কেনাবেচা করেই ক্ষান্ত হবে না, তারা চাষিদের প্রযুক্তি বেচবে, চুক্তি মোতাবেক রপ্তানির উপযোগী ফসল চাষ করাবে। রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। এই ভাবে খাদ্যশস্য চাষ কমিয়ে রপ্তানিযোগ্য শস্য চাষ বাড়াবে। WTO নীতি কার্যকর হবার পর থেকে ভারতে খাদ্যশস্যের জমি ও উৎপাদন কমার এবং ফল সব্জি ইত্যাদির জমি ও উৎপাদন বাড়ার একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। (তালিকা ১ দ্রষ্টব্য)

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ার পর এই প্রবণতা আরও তীব্র হবে। আমাদের দেশের পরিণতি তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর থেকে কিছু আলাদা হবে না।

কিছু পত্রিকা প্রচুর আনন্দে বাজারের এই পরিবর্তনের খবর ছাপছে। খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের খবর প্রকাশিত হচ্ছে একেবারে প্রথম পাতায়। বিদেশি কোম্পানি চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য কিনলে চাষিদের কত সুবিধা, বজ্জাত ফড়ে-দালালরা এতে কীভাবে জব্দ হবে এই সব নানান কথা ফলাও

তালিকা - ১

১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০২-০৩ পর্যন্ত কয়েকটি কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োজিত জমি ও উৎপাদনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

[প্রথম পাঁচটির ক্ষেত্রে জমি ১০ লক্ষ হেক্টরে, উৎপাদন ১০ লক্ষ টনে; পরের সাতটির ক্ষেত্রে জমি হাজার হেক্টরে উৎপাদন হাজার টনে]

ক্রমিক সংখ্যা	ফসলের নাম	১৯৯২-৯৩ নিয়োজিত জমি	১৯৯২-৯৩ উৎপাদন	২০০২-০৩ নিয়োজিত জমি	২০০২-০৩ উৎপাদন	১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০২-০৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির শতকরা পরিমাণ জমি	১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০২-০৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির শতকরা পরিমাণ উৎপাদন
১	ধান	৪১.৭৮	৭২.৮৬	৪১.১৮	৭১.৮২	-১.৪৩	-১.৪২
২	গম	২৪.৫৮	৫৭.২১	২৪.৮৬	৬৫.১০	১.১০	১৩.৭৮
৩	ক্ষুদ্র দানাশস্য	১.৯৮	০.৮৬৮	১.২০	০.৫৯	-৩৯.৪	-৩২.০৫
৪	সরষে ও রেপসীড	৬.১৯	৪.৮০	৪.৪৮	৩.৮৪	-২৭.৬	-২০.০
৫	মোট খাদ্যশস্য	১২৩.১৫	১৭৯.৪৮	১১৩.৮৬	১৭৪.৭৭	-৭.৫	-২.৬২
৬	কমলালেবু	৫০.০৬	২০২.৯৪	১৩১.৬০	১২১১.৯৬	১৬২.৯০	৪৯৭.২
৭	আনারস	০.৫৩	১১.৩৯	১.২৪	৩৮.৩৭	১৩৬.১৯	২৩৭.০২
৮	আম	৭০৩.৫৬	৩৬৮৬.০৩	১০৭৯.১১	৫৮৩০.১০	৫৩.৩৮	৫৮.৩০
৯	কলা	১৭৯.৭৫	৬৯০৯.০২	২৩৭.৮০	৯৬৪১.৮৪	৩২.৮০	৩৯.৫৫
১০	ফুলকপি	২.০	৪৮.০	৪.৬৭	১০৭.০৯	১৩৩.৫০	১২৩.১০
১১	আদা	১.৮৪	৪.১৮	৪.২৭	৩২.৪৩	১৩১.৮১	৬৭৬.২
১২	টমাটো	৪৭.৮৬	৫৭২.৮৩	৮০.৪১	৮৯৯.৫৫	৬৮.০২	৫৭.০৪

সূত্র: Agricultural Statistics at a Glance, 2005, GOI

করে বলা হচ্ছে। ফড়েরা চাষিদের ঠকায় ঠিকই, কিন্তু তাদের ঠকানোর ক্ষমতা সীমিত, আর এই কোম্পানিগুলি গোটা দেশের চাষিদের সর্বস্বান্ত করে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। অবশ্য প্রথম প্রথম ফড়েদের হটাবার জন্যই চাষিকে কিছু বেশি দাম দেওয়া হবে। তবে টোপ দিয়ে শিকার ধরার উদাহরণ শুধু মনুষ্য সমাজেই নয়, গোটা জীব জগতেই অনেক আছে।

বহুজাতিক কোম্পানির সাথে চুক্তি চাষের তিক্ত অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে চাষিরা অর্জন করেছেন। পেপসি কোম্পানির সাথে চুক্তিতে টম্যাটো চাষ করতে গিয়ে পাঞ্জাবের চাষীরা ৭৫ পয়সা কেজি দরে টম্যাটো বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল যখন খোলা বাজারে অন্তত ২ টাকা দাম পাওয়া যেত।[১২]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সহ ইংরেজদের যাবতীয় বর্বরতা সম্পর্কে চোখ বুজে থেকে যারা বলত সতীদাহ রদ করে ভারতীয়দের সভ্য করার জন্যেই ইংরেজরা এদেশে এসেছে, তাদের সাথে এই বাজারি পত্রিকাগুলোর তফাত অল্পই।

ভর্তুকি হ্রাস

WTO চুক্তিতে ভর্তুকিকে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল, যেমন:

১। বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ভর্তুকি (Trade Distorting Subsidy) —যে সকল ভর্তুকি কৃষি উৎপাদনের মূল্য বা পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে তাকে বলা হল বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ভর্তুকি। যেমন সরকার যদি সার বীজ ইত্যাদিতে ভর্তুকি দেয় তাহলে কৃষক বাজার থেকে কম মূল্যে সেগুলি কিনতে পারবে। অথবা সরকার যদি কোনো কৃষিপণ্য বাজারের থেকে বেশি মূল্যে কিনে নেয় তাহলে চাষির আয় বাড়বে। WTO-র মতে এ সবই বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং এই জাতীয় ভর্তুকি কমাতে হবে। সারা বছর ধরে প্রদত্ত বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মোট ভর্তুকিকে বলা হয় Agreegate Measurement Support বা AMS। ১৯৯৫ সালে চুক্তি হয় যে আগামী ৬ বছরের মধ্যে উন্নত দেশগুলি AMS ভর্তুকি ২০% কমাবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই খাতে ভর্তুকি কমাবে ১৩ %।[২২]

২। বিযুক্ত অর্থ সাহায্য (Decoupled Payment) : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলিতে কৃষকদের সরকার পক্ষ থেকে সরাসরি অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয়। WTO-র মতে এইভাবে সাহায্য করলে নাকি কৃষিপণ্যের দাম ও

তালিকা - ২

ইউরোপীয় কমিউনিটি ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত গ্রীন-বক্স ও ব্লু-বক্স এবং AMS ভর্তুকির পরিমাণ

	১৯৮৬-৮৮	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
ইউরোপ কমিউনিটির দেশ : (মিলিয়ন ইউরো)				
গ্রীন-বক্স	৯২৩৩.৪	১৮৭৭৯.২	২২১৩০.৩	—
ব্লু-বক্স	—	২০৮৪৩.৫	২১৫২০.৮	—
AMS	৭৩৬৪৪.৯	৪৯৮২৩.৪	৫০৭৫১.৫	—
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : (মার্কিন ডলার)				
গ্রীন-বক্স	২৪০৯৮	৪৬০৪১	৫১৮২৫	৫১২৪৯
ব্লু-বক্স	—	৭০৩০	—	—
AMS	২৪৬৫৯	৬৩১০	৫৮৬৭	৬৪৭৪

সূত্র: Liberalisation of Agricultural Trade in the WTO Regime, UPDATE, series 5

পরিমাণের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই একে বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ভর্তুকি বলা যাবে না। এই ধরনের সাহায্যকে তাই নাম দেওয়া হয়েছে বিযুক্ত অর্থসাহায্য। এই ধরনের ভর্তুকিগুলিকে গ্রীন বক্স, ব্লু বক্স ইত্যাদি নাম দেওযা হয়েছে। গ্রীন বক্স ভর্তুকি দেওয়া হয় মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এক্ষেত্রে বাজারে কৃষিপণ্যের দর ওঠানামা সত্ত্বেও কৃষক যাতে একটি নির্দিষ্ট হারে আয় করতে পারে তার জন্য তাকে সরাসরি নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। ব্লু বক্স চলে ইউরোপের দেশগুলিতে। সেই সব দেশের চাষিরা যাতে কৃষিপণ্যের উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে সেজন্য তাদের নগদ টাকা দেওয়া হয়। এছাড়া গ্রীনবক্স ভর্তুকিও ইউরোপের দেশগুলিতে বেশ ভালো রকমই দেওয়া হয়।[২২]

WTO চুক্তিতে বিযুক্ত অর্থসাহায্য কমাবার কোনো উল্লেখ নেই। তাই গ্রীন বক্স ব্লু বক্স ইত্যাদি রঙিন নামের আড়ালে উন্নত দেশের চাষিদের অকল্পনীয় ভর্তুকি দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল (তালিকা-২ দ্রষ্টব্য)

এই ভর্তুকির অধিকাংশটাই যায় সে দেশের মুষ্টিমেয় অতিবৃহৎ খামার মালিকদের পকেটে। তালিকা ২ থেকে দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন WTO উত্তরকালে AMS ভর্তুকি যত কমিয়েছে, গ্রীনবক্স ব্লু বক্স ভর্তুকি বাড়িয়েছে তার থেকে অনেক বেশি।

সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের দেশের গোটা কৃষি ব্যবস্থাটাকে সার বীজ আর বিদেশি বীজের উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়। সবুজ বিপ্লব যাতে ব্যাপক প্রসারলাভ করতে পারে তার জন্য সার বীজে ভর্তুকি দেওয়া হয়। তথাকথিত বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ভর্তুকি কমানোর জন্য ভারতের ওপর WTO-র প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু রাসায়নিক নির্ভর বিদেশি বীজ সর্ব্বস্ব কৃষি প্রযুক্তির পরিবর্তে কোনো সুস্থায়ী জৈব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। যদিও বহু গবেষণায় একথা সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত যে রাসায়নিক বিহীন কৃষি উৎপাদনশীলতায়, স্থায়িত্বে এবং খাদ্য স্বয়ম্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে রাসায়নিক কৃষির থেকে অনেকাংশেই ভালো।[৩] এখন বিকল্পের ব্যবস্থা না করে যদি হঠাৎ তথাকথিত 'বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ভর্তুকি' তুলে নেওয়া হয় তাতে দেশের কৃষক সমাজ যে চরম সংকটের মধ্যে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

ইউরোপ আমেরিকা বা জাপানের তুলনায় ভারতের চাষিরা খুবই নগণ্য ভর্তুকি পায়। (তালিকা-৩ দ্রষ্টব্য) অন্যদিকে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য ও অবাধ রাসায়নিক সার বিষ ব্যবহার না করে চাষ করার চমৎকার সব কলাকৌশল থাকলেও সে সম্পর্কে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন। স্বভাবতই দেশের চাষিরা কিছুতেই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। তাই বিদেশি কোম্পানির মর্জিমতো আমাদের দেশের কৃষকরা কৃষিব্যবস্থা বদলে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন এবং তার ফল আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ভর্তুকি প্রশ্নে দেশের কৃষক সমাজের যে দাবি এক্ষুণি জোরালো গলায় তোলা উচিত তা হলো— সারে ভর্তুকি দেবার নামে সার কোম্পানির মুনাফা বাড়াবার এই নষ্টামির পরিবর্তে ভর্তুকির টাকা সরাসরি কৃষককে দেওযা হোক। ভর্তুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মধ্য কৃষককে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। সামগ্রিকভাবে কৃষিতে ভর্তুকি বাড়ানো হোক।

কৃষিক্ষেত্রে পেটেন্ট ও সুই জেনারিস সিষ্টেম

এই বিষয়গুলি কিছু আলোচনার আগে জীববিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয় ও মেধাস্বত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার মতো উদ্ভিদ সারা পৃথিবীতে সমানভাবে পাওয়া যায় না। ভ্যাভিলভ (১৯৩৫), হারল্যান (১৯৭১) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর এমন কয়েকটি অঞ্চল চিহ্নিত করেছিলেন যেখানে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন

তালিকা - ৩

কয়েকটি উন্নত দেশ ও ভারতের কৃষি ভর্তুকির তুলনামূলক চিত্র (মার্কিন ডলারে) (ভিত্তি বর্ষ : ১৯৮৬-৮৮)

দেশ	১৯৮৬-৮৮		১৯৯৭		১৯৯৮		১৯৯৯	
	কৃষক প্রতি	হেক্টর প্রতি	কৃষক প্রতি	হেক্টর প্রতি	কৃষক প্রতি	হেক্টর প্রতি	কৃষক প্রতি	হেক্টর প্রতি
কানাডা	১২০০০	৭৫	৭০০০	৪২	৭০০০	৪২	৯০০০	৫২
ইউরোপ কমিউনিটি	১১০০০	৭০৭	১৬০০০	৮১৫	১৬০০০	৮১৫	১৭০০০	৮৩১
জাপান	১৫০০০	১০০৪৮	২১০০০	১০২১১	২১০০০	১০২১১	২৬০০০	১১৭৯২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৭০০০	৯৮	১২০০০	৭৩	১২০০০	৭৩	২১০০০	১২৯
ভারত	১১	৮	৫৫	৪৩	৫৫	৪৩	৬৬	৫৩

সূত্র: Alternative Economic Survey, 2002-03

উদ্ভিদ সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলগুলি হল— ১) চীন, ২) ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ৩) মধ্য এশিয়া, ৪) এশিয়া মাইনর, ৫) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ৬) ইথিওপিয়া, ৭) মেক্সিকো, ৮) আন্ডিজ চিলি ও আমাজন অঞ্চল।

তালিকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই অঞ্চলগুলির প্রায় সব কটিই অধুনা তৃতীয় বিশ্বে অবস্থিত। এই অঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন উদ্ভিদ বিকশিত হবার কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, এই অঞ্চলগুলি ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হবার দরুন প্রাগ-ঐতিহাসিক হিমযুগে জমে যায় নি, ফলে এখানকার উদ্ভিদকূল অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। দ্বিতীয়ত, এই সব অঞ্চলেই আদিম মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই আদিম সভ্যতার কৃষকরা স্থানীয় জঙ্গল খুঁজে মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাবার মত বিভিন্ন উদ্ভিদকে চিহ্নিত করেছিল, সেই উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিল এবং তাদের অনেকগুলিকে চাষ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে দিল। চাষযোগ্য উদ্ভিদগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শনাক্ত করা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নির্বাচন করে তা থেকে অসংখ্য আশ্চর্য গুণসম্পন্ন জাত সৃষ্টি করা তৃতীয় বিশ্বের তথাকথিত অশিক্ষিত কৃষকদেরই অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাই তৃতীয় বিশ্বের এই জৈব বৈচিত্র নিছক প্রকৃতির দান নয়, এগুলি এখানকার কৃষকের বহু প্রজন্মের কায়িক ও মেধাশ্রমের ফসল। তাই কোষ্টারিকা ও গুয়াতেমালার আয়তন অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও সে অঞ্চলে গোটা উত্তর আমেরিকার (মেক্সিকো বাদে) সমান সংখ্যক প্রজাতি খুঁজে পাওয়া যাবে।[২৩] ভারতবর্ষের ৭০০০টি অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন উদ্ভিদ আছে। এর মধ্যে ৩৯০০টি খাদ্য হিসাবে, ৫২৫টি তন্তু উৎপাদনে, ৪০০ পশু খাদ্য হিসাবে, ৩০০টি কীটনাশক হিসাবে, ৩০০টি আঠা ও রঙ প্রস্তুত করতে, ১০০টি সুগন্ধি হিসাবে এবং বাকি প্রজাতি সমূহ বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত করতে অথবা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।[২৪] এই সমস্ত উদ্ভিদ প্রজাতিগুলির অসংখ্য ভ্যারাইটি ছিল, যেমন সবুজ বিপ্লব শুরু হবার আগে কেবল ধানেরই লক্ষাধিক ভ্যারাইটি ছিল।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো এই সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশের গোটা কৃষি ব্যবস্থাটাই তৃতীয় বিশ্ব থেকে নিয়ে আসা প্রাণী ও উদ্ভিদ বীজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শুধু কৃষি নয়, শিল্পে ব্যবহৃত বহু উদ্ভিদেরও উৎসস্থল তৃতীয় বিশ্ব। '৭০ এর দশকে ফোর্ড ও রকফেলার ফাউন্ডেশনের টাকায় পরিচালিত IBPGR (International Board of Plant Genetic Resources) পরিচালিত সমস্ত তৃতীয় বিশ্ব খুঁজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন উদ্ভিদের অসংখ্য জাত সংগ্রহ করেছিল।[২৩] এর জন্য তৃতীয় বিশ্বের কৃষকদের সম্মান দক্ষিণা দেওয়া দূরে থাক উৎস দেশগুলির বৈজ্ঞানিকদের সংগৃহীত জাতগুলি নিয়ে গবেষণার কোনো সুযোগও তারা দেয়নি।[২৩] সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যত দিন তৃতীয় বিশ্বের এই উদ্ভিদ সম্পদ (বা জীব বৈচিত্র্যের) উপর কব্জা করতে পারে নি, ততদিন তাদের বক্তব্য ছিল এই সম্পদ প্রকৃতির দান, তাই সমগ্র মানবজাতির এর উপর সমান অধিকার।

সবুজ বিপ্লবের পর সামান্য কয়েকটি তথাকথিত উচ্চফলনশীল বীজ গোটা দেশ জুড়ে চাষ করা শুরু হল। ফলে অনেক দেশি জাত চাষ না করার জন্য অবলুপ্ত হতে শুরু করলো। চাষি আগে বীজ নিজেই উৎপাদন করত, ক্রমশ সে বীজের ব্যাপারে বাজার বা কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকলো। বীজের ব্যবসা আস্তে আস্তে একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হতে থাকলো। তৃতীয় বিশ্ব থেকে সংগ্রহ করা বহু ফসলের বহু উচ্চগুণমানের জাত ব্যবহার করেই বীজ কোম্পানিগুলি তাদের বীজ তৈরি করে। এই বীজগুলো যাতে কোম্পানিকে পয়সা না দিয়ে চাষি ব্যবহার করতে না পারে, আর চাষির উদ্ভাবিত বীজ যাতে কোম্পানি সহজেই আত্মসাৎ করতে পারে তার জন্য পেটেন্ট আইন সংশোধনের প্রয়োজন পড়লো। WTO-তে ঘটা করে মেধাস্বত্ব আইন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কৃষিক্ষেত্রে এই মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত চুক্তিটি চাষির হাত থেকে বীজ নামক উৎপাদনের উপকরণটি কেড়ে

নেবার এক উপায় হয়ে দাঁড়ালো। প্রাক বিশ্বায়ন যুগে ভারতে চালু পেটেন্ট আইন মোতাবেক কোনো গবেষক যদি কোনো পণ্য বানাবার একটা বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করে তাহলে ওই আবিষ্কারের পর বেশ কিছু বছর ওই পদ্ধতি আর কেউ ব্যবহার করলে আবিষ্কর্তার অনুমতি (প্রয়োজনে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে) নিতে হবে। WTO চুক্তি অনুসারে এই আইনে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল ঘটাতে হবে। শুধু পণ্য বানাবার পদ্ধতি নয়, উৎপন্ন পণ্যটি যদি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনো বস্তু হয়, তাহলে সেই বস্তুটিও পেটেন্টের আওতায় আসবে। আবিষ্কর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ ওই পণ্য উৎপাদন বা ব্যবহার করতে পারবে না। কৃষিক্ষেত্র মেধাস্বত্ব আইনের আওতায় আসার ফলে ভারতীয় বীজ আইনের খোলনলচে বদলে গেল। ভারতের অতুলনীয় জৈব বৈচিত্র্য যেহেতু এদেশের গোটা কৃষক সমাজের সম্পদ তাই বিভিন্ন উদ্ভিদের জাতগুলিকে কখনও আলাদা করে রেজিস্ট্রেশনের প্রশ্ন ওঠেনি। ভারতের পেটেন্ট আইনে (১৯৭০) প্রথম থেকেই কৃষি ও উদ্যান বিদ্যাকে পেটেন্টের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।[২৫] কিন্তু WTO-র বাণিজ্য বিষয়ক মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত চুক্তিতে (Trade Related Intellectual Property Rights বা TRIPs) বলা হয়েছে, সদস্য দেশগুলিকে অবশ্যই কোনো বিশেষ জাতের উপর তার আবিষ্কর্তার অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। তার জন্য হয় পেটেন্ট আইনের বদল ঘটাতে হবে অথবা সুই জেনারিস সিস্টেমের মত কোনো ব্যবস্থা করতে হবে অথবা পেটেন্ট আইন ও সুই জেনারিস উভয় ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্ভিদজাত উদ্ভাবকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। সুই জেনারিস ব্যবস্থা পেটেন্ট আইনেরই একটু শিথিল রূপ যেখানে বীজ বিনিময় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন জাতের উদ্ভিদ উদ্ভাবকদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়।[২৫]

এই চুক্তি লাগু হবার পর বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি আমাদের দেশের নানান উদ্ভিদের উপর যথেচ্ছ পেটেন্ট দাবি করে বসলো। নিম, হলুদ, গোলমরিচ, সর্ষে ইত্যাদি বহু উদ্ভিদ পেটেন্ট হয়ে যাবার কথা অনেকেই শুনেছেন। এই সমস্ত উদ্ভিদের ব্যবহার এবং গুণাগুণ যেহেতু নথিভুক্ত ছিল না, তাই অনেক কোম্পানি দাবি করে বসলো যে এগুলির গুণাগুণ এবং ব্যবহার তাদেরই আবিষ্কার। অতএব তারা এগুলোর উপর পেটেন্টের ন্যায্য হকদার। অন্য কেউ এই উদ্ভিদগুলি ব্যবহার করতে চাইলে উপযুক্ত কাঞ্চনমূল্যে অনুমতি নিতে হবে। এইসব অন্যায় পেটেন্ট রদ করার জন্য ভারতকে বহু বিদেশি মুদ্রা খরচ করে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে হয়েছিল।

WTO-র সদস্য দেশ হিসাবে ভারত কৃষিক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রথম যে আইনটি পাশ করলো তার নাম Protection of Plant Variety and Farmers Rights Act (PPVFR);[২৫] যদিও এই আইন বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থরক্ষা করার জন্যই করা হয়েছিল, তবুও এখানে দেশের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার একটা চেষ্টা ছিল। এই আইনে বলা হল, কোনো চাষি যদি বহুজাতিক কোম্পানির পেটেন্ট করা কোনো বীজ চাষ করেন তবে তিনি তা থেকে সরাসরি বা সংকরায়নের মাধ্যমে কোনো নতুন বীজ বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করতে পারবেন না। এই আইনে অবশ্য চাষিদের নিজেদের বীজ সংরক্ষণ করা, ব্যবহার করা এবং বিনিময় করার অধিকার বলবৎ থাকলো এবং নিজেদের উদ্ভাবিত বীজের উপর মেধাস্বত্ব দাবি করার সুযোগও থাকলো। তবে এইসব সুযোগ ও অধিকার গ্রহণ করতে হলে চাষীদের নিজেদের বীজগুলিকে নথিভুক্ত করতে হবে। PPVFR-এ চাষীদের জন্য বিনামূল্যে বীজ নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা থাকলেও নথিভুক্তকরণের পদ্ধতিটি বেশ জটিল করা হলো। গ্রামের স্বল্প-শিক্ষিত চাষীদের পক্ষে এইভাবে নিজেদের বীজ নথিভুক্ত করা যথেষ্টই কঠিন।

অ-নথিভুক্ত বীজ রাখার ব্যাপারে অবশ্য এই আইন অত্যন্ত কঠোর। এই আইনে বীজ ইন্সপেক্টরদের এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে তারা যে কোনো সময় প্রয়োজনে দরজা ভেঙে ঢুকে তল্লাসি চালিয়ে দেখতে পারে কোথাও অ-নথিভুক্ত বীজ আছে কিনা। স্পষ্টই বোঝা যায়, আগে যেমন চাষিরা অবাধে বীজ সংরক্ষণ ব্যবহার ও বিনিময় করতে পারতো এই আইন নিঃসন্দেহে সেই অধিকার অনেকটা খর্ব করলো। তাও PPVFR কিন্তু WTO সাহেবদের খুশি করতে পারলো না। বীজের বাজার কব্জা করার জন্য তাদের আরও কঠোর আইনের দরকার ছিল। WTO-র চাপে এবার নতুন আইনের প্রস্তাব হলো, যার নাম Seed Bill 2004। এই আইনে বীজের ওপর চাষিদের প্রায় সমস্ত অধিকার নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলে বীজের বীজারে বহুজাতিক কোম্পানির অবাধ অবাধ আধিপত্য বিস্তারের সবরকম ব্যবস্থা পাকা করা হল। এই প্রসঙ্গে দুটি আইনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হল —

(১) PPVFR অনুসারে কোনো উদ্ভিদ প্রজননবিদ বা সংস্থা তার উদ্ভাবিত কৃষিজ ফসলের জাতের উপর ১৫ বছর ও বৃক্ষের উপর ১৮ বছরের জন্য অধিকার বলবৎ রাখতে পারে। নতুন আইনে তা দ্বিগুণ বাড়িয়ে যথাক্রমে ৩০ বছর ও ৩৬ বছর করা হল।[২৭]

(২) PPVFR অনুসারে কোনো নতুন জাতের নথিভুক্তির জন্য সেই জাতের উৎস বলতে হতো এবং বংশগতি বিস্তারিত জানাতে হতো। নতুন জাতটির বিশুদ্ধতা, নতুনত্ব এবং বৈধতা পরীক্ষা করতো কোনো জাতীয় সংস্থা। নতুন বীজ বিলে এসবের কোনো বালাই নেই। কোনো নতুন জাত যে আগে আনবে সেই নথিভুক্ত করতে পারবে এবং নথিভুক্ত করার আগে তার বিশুদ্ধতা বৈধতা এবং নতুনত্ব সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারা করবে তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই।[২৭]

(৩) PPVFR-এ কোনো নতুন জাত নথিভুক্ত করার আগে সে সংক্রান্ত আপত্তি জানাবার অবকাশ ছিল। নতুন আইনে কোনো জাত নথিভুক্ত হয়েছে কিনা তা জানা যাবে কেবল নথিভুক্তির পর। ফলে কোনো জাতের নথিভুক্ত সংক্রান্ত কোনো আপত্তি থাকলে তা নথিভুক্তির আগে জানাবার কোনো উপায় থাকছে না।[২৭]

(৪) PPVFR-এ কোনো নতুন জাত নথিভুক্তির জন্য কোনো মাসুল লাগতো না, নতুন আইনে মাসুল প্রয়োজন।[২৭]

(৫) নতুন আইনে বীজ সরবরাহ, বীজের দাম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের সম্পর্কে কোনো কথা বলা নেই।[২৭]

(৬) PPVFR-এ বীজের গুণমান খারাপ হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল, নতুন আইনে কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই, ক্ষতিগ্রস্থ চাষিকে জেলা আদালতের দরজা দেখানো আছে।[২৭]

অর্থাৎ, Seed Bill 2004 অনুসারে কোনো কোম্পানি উৎস না জানিয়ে সবরকম আপত্তি এড়িয়ে কোনো জাতকে নথিভুক্ত করতে পারবে, নথিভুক্তির আগে জাতটি কে পরীক্ষা করবে তাও স্পষ্ট নয়। এই আইনবলে বহুজাতিকগুলিকে চাষির উদ্ভাবিত দেশীয় জাত বা জিন বদলানো ক্ষতিকর জাতগুলিকে চুপি চুপি নিজেদের নামে নথিভুক্ত করতে পারবে। কোম্পানির দেওয়া কোনো জাত চাষ করতে গিয়ে চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সরাসরি ক্ষতিপূরণ দেবার ঝামেলাও নেই, চাষি আগে জেলা আদালতে প্রমাণ তো করুক যে ওই বীজের জন্যেই ক্ষতি হয়েছে তারপর অন্য কথা। বীজের দাম নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই যথেচ্ছ দামে চাষিকে বীজ বেচা যাবে। কোম্পানিকে খুশি করার আইন বটে।

আবার চাষিরা আগে নিজেদের উদ্ভাবিত বীজগুলি নথিভুক্ত করতে গিয়ে কেবল কাগজপত্রের জটিলতার সম্মুখীন হতো, এখন তাদের গাঁটের কড়িও খরচ করতে হবে। বলাই বাহুল্য, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, এমনকি মধ্য কৃষকদের পক্ষেও নিজেদের উদ্ভাবিত জাত নথিভুক্ত করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে, অথচ এরাই আমাদের জিন সম্পদের প্রকৃত রক্ষক।

প্রবল গণবিক্ষোভের চাপে এই বীজ বিল এখনও কার্যকর হয় নি বটে তবে WTO-র চাপে হয়তো অচিরেই কার্যকর হবে।

বীজ বিল চালু হবার আগেই মনস্যান্টো কোম্পানি তুলোর বীজ বিক্রি করে অন্ধ্রপ্রদেশের চাষিদের সর্বনাশ করেছিল। মনস্যান্টো কোম্পানি তুলোর বীজ বিক্রির সময় চাষিকে বলেছিল যে এই তুলো সর্বপতঙ্গ প্রতিরোধী। বলা হয়েছিল, এই তুলো চাষ করলে কীটনাশক লাগবে না, ফলন হবে দুর্দান্ত। কোম্পানির কথায় ভুলে চাষীরা অনেক বেশি দাম দিয়ে তুলোর বীজ ও প্রযুক্তি কেনে। কিন্তু বাস্তবে রোগ ও পোকার আক্রমণে তুলোর ক্ষেত উজাড় হয়ে যায়। ঋণভারে জর্জরিত সর্বস্বান্ত চাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ২০০৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষিমন্ত্রী স্টার টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলে দিলেন, তার রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যার প্রধান কারণ তুলোর সার্বিক ব্যর্থতা।[৪] বীজ বিল লাগু হবার আগেই এই অবস্থা, লাগু হলে কী হবে সহজেই বোঝা যায়।

কৃষিপণ্যের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গুণমান

WTO-র Official Website-এ বলা আছে যে মানুষ যাতে সুরক্ষিত, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পায় তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই কৃষিজ পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট গুণমান (Sanitary and Phyto Sanitary measure বা SPS) বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে যে কৃষিপণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে প্যাঁচে ফেলার জন্যই এই বিধি ব্যবহার করা হয়। প্রায়শই দেখা যায় কোনো কোনো কৃষিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি পণ্যের যে গুণমান দাবি করেছে, সেই গুণমানের পণ্য উৎপাদন করা উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অনেক সময়ই কাঙিক্ষত গুণমান বজায় রাখার জন্য উন্নত দেশ থেকে যন্ত্র আমদানী করতে হয়। যেমন দুধ হাতে দেওয়া হলে তা না কী যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর নয়। তাই দুধ রপ্তানী করতে হলে দুধ দোয়ার মেশিন কিনতে হবে। গুণমান সংক্রান্ত এ হেন খুঁতখুঁতানির জন্য WTO-র অন্তর্গত ১৩৫টি দেশের মধ্যে মাত্র ১৫টি দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে ঠাণ্ডায় জমানো কাঁচা মুরগীর মাংস রপ্তানীর অনুমতি পেয়েছে। আমেরিকাতে রপ্তানীর অনুমতি পেয়েছে ৫টি দেশ আর কানাডাতে মাত্র একটি দেশ।[২৪]

গুণমান সংক্রান্ত কারণে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশটির কী পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল সে কথাতো আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ সঠিক গুণমানের চিংড়ি উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত এক কোটি ৪০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের প্রযুক্তি[১৫] (HACCP-8, বিকিরনের সাহায্যে খাদ্য শোধনের মার্কিন প্রযুক্তি)[২৭] কিনেছিল এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও ২৪ লক্ষ মার্কিন ডলার খরচ করেছিল।[১৫] এর পরেও চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি বিরাট ধাক্কা খায়।

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে মশলা, বাদাম, আম, দুধ ইত্যাদি রপ্তানি করতে গিয়ে এই গুণমান সংক্রান্ত সমস্যায় পড়েছে। ভারতের ক্রান্তিয় জলবায়ুতে প্রায়ই বিভিন্ন ফসল ছত্রাকের দ্বারা (অ্যাসপ্যারাজিলাস ইত্যাদি) আক্রান্ত হয়। ছত্রাকের আক্রমণে ফসলে আফলাটক্সিন বলে একধরনের বিষ উৎপন্ন হয়, যা শরীরে ক্যানসার সহ বহু রোগ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে যে খাবারে ৫০ PPb এর কম মাত্রায়, অর্থাৎ কিনা ১০০ কোটি ভাগ খাবারে ৫০ ভাগেরও কম আফলাটক্সিন থাকলে মানুষের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না।[৩০] তবে বিজ্ঞানীরা যাই বলুক ইউরোপীয় ইউনিয়নে মশলা বাদাম দুধ ইত্যাদি রপ্তানি করতে গেলে এই আফলাটক্সিন বিষের মাত্রা নিয়ে নানান টালবাহানা করা হয়। যদিও আফলাটক্সিনের নিরাপদ মাত্রা ৫০ PPb কিন্তু

তালিকা - ৪

পশু মাংস ও তা উৎপাদনে ব্যবহৃত দানাশস্যে নিহিত শক্তি ও প্রোটিনের তুলনামূলক পরিমাণ

পশু মাংস ও তার উৎপাদনে ব্যবহৃত দানাশস্য	নিহিত শক্তি (ক্যালোরি)	প্রোটিন (গ্রাম)
১ কেজি মুরগীর মাংস	১০৯০	২৫৯
২ কেজি দানাশস্য	৬৯০০	২০০
১ কেজি শুয়োরের মাংস	১১৮০	১৮৭
৩ কেজি দানাশস্য	১০৩৫০	৩০০
১ কেজি গো মাংস	১১৪০	২২৬
৭ কেজি দানাশস্য	২৪১৫০	৭০০

সূত্র: Patnaik Utsa: Origins of Food Crisis in India and Developing Countries

সুইজারল্যাণ্ড 6PPb-এর আফলাটক্সিন থাকলে কৃষিজ পণ্য নেবে না।[১৫], জার্মানী আর ডেনমার্ক 4PPb-এর বেশি থাকলে নেবে না।[১৫] আর সবার ওপরে বেলজিয়াম। তাদের দেশে কিছু রপ্তানী করতে হলে আফলাটক্সিনের পরিমাণ হতে হবে একেবারে শূন্য।[১৫]

এই জাতীয় গুণমান বজায় রাখতে গেলে অত্যন্ত দাম দিয়ে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয়। তাতেও অনেক সময় বাজার ধরা যায় না। আমদানিকারক দেশ থকে একতরফা ভাবে আরও কঠোর গুণমানের শর্ত আরোপ করা হয়।

রপ্তানির বাজারে ভারত আর যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো, আমদানিকারক দেশগুলি ভারতীয় কোনো সংস্থার দেওয়া গুণমান সংক্রান্ত সার্টিফিকেট গ্রাহ্য করে না। যে কৃষিজ পণ্য ভারতীয় সংস্থার সার্টিফিকেট পেয়েছে তাও হয়তো কোনো দেশ যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর নয় বলে একতরফাভাবে খারিজ করে দিল।[১৫]

এইভাবে আমদানিকারক দেশগুলি আমাদের উপর ধারা-বাহিক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে এবং দরকষাকষিতে আমাদের অসুবিধাজনক জায়গায় রেখেছে।

বুভুক্ষা

WTO পরবর্তী যুগে বিশ্বের গরীব দেশগুলোর কৃষিজমি ক্রমশই বেশি বেশি করে দামি কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতে পারতো তাতে বড়লোকদের জন্য দামি দামি ফলফুল সব্জি ফলানো হচ্ছে অথবা ব্যবহার করা হচ্ছে পশুচারণ ভূমি হিসাবে, যাতে আরও মাংস আর দুধ উৎপাদন করা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ব্রাজিলের মত দেশে খাদ্যশস্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহার করা হচ্ছে ইথানলের মত জৈব জ্বালানি তৈরির কাজে। যেমন আমেরিকায় ২০০৫ সালে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের ১৪% ব্যবহার করা হয়েছিল ৪ বিলিয়ন গ্যালন ইথানল উৎপাদন করতে।[৩১] এইভাবে মানুষের খাবার মোটরগাড়িকে খাওয়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্রথম বিশ্বের মানুষ ও তৃতীয় বিশ্বের হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠা মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের অতিভোজী জীবনের চাহিদা মেটাতে খাদ্য তালিকায় মাংসের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। মাংস উৎপাদনের বড় বড় কোম্পানিগুলি মানুষের খাওয়ার উপযোগী দানাশস্য সয়াবিন ইত্যাদিকে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করছে। ১ কেজি মুরগির মাংস বানাবার জন্য ব্যবহার হচ্ছে ২ কেজি দানাশস্য। আর ১ কেজি গোমাংস উৎপন্ন করতে লাগছে ৭ কেজি দানাশস্য। অথচ ১ কেজি গোমাংস থেকে পাওয়া যায় মাত্র ১১৪০ ক্যালোরি শক্তি আর ২২৬ গ্রাম প্রোটিন, যেখানে ৭ কেজি দানাশস্য থেকে অন্তত ২৪১৫০ ক্যালোরি শক্তি আর ৭০০ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যাবে (তালিকা ৪ দ্রষ্টব্য)। একটা আধ পাউন্ডের বিফ বার্গার বানাতে যে পরিমাণ শক্তি ও প্রোটিন খরচ হয় তা দিয়ে অন্তত তিনজন লোকের দৈনিক সম্পূর্ণ ক্যালোরি ও প্রোটিনের চাহিদা মেটাবার মত ডাল রুটির যোগান দেওয়া সম্ভব।[৩২] মাংসই প্রধান খাদ্য এমন একজন মানুষ বছরে প্রায় ১০০০ কেজি দানাশস্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খেয়ে নেয়; যেখানে মূলত দানাশস্য খেলে বছরে ১৩০ কেজিই যথেষ্ট।[৩২] এই ভাবে বড়লোকদের খাবার যোগানের জন্য গরিবদের খাবারে টান পড়ছে।

উপরের কারণগুলি সম্মিলিত ফল হল খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। ২০০৭-২০০৮ সালে খাদ্যশস্যের মারাত্মক মূল্যবৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর দেশে দেশে খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। ভারতের একাধিক সমীক্ষায় মা ও শিশুদের অপুষ্টির যে ছবি পাওয়া গেছে তা থেকেই বোঝা যায় এদেশের মানুষ কীভাবে কী খেয়ে প্রাণধারণ করে। শিশু অপুষ্টিতে ভারতের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়।[৩৩] ভারতে অপুষ্টির মাত্রা এমন কি সাহারা সন্নিহিত আফ্রিকার থেকেও খারাপ।[৩৪] পৃথিবীর প্রতি ৩টি অপুষ্ট শিশুর একটি ভারতীয়। অপুষ্টির কারণে ভারতীয় শিশুদের ৪৭ শতাংশেরই ওজন স্বাভাবিকের থেকে কম।[৩৪] ১৬ শতাংশ শিশুর অপুষ্টির মাত্রা অত্যন্ত তীব্র। ভারতের ৭৪ শতাংশ শিশু, ৯০ শতাংশ কিশোরী এবং ৫০ শতাংশ মহিলা

রক্তাল্পতায় ভোগেন।[৩৪] প্রতি বছর ভারতে ২১ লক্ষ শিশু ৫ বছর বয়স হবার আগেই মারা যায় এবং এই শিশু মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি।[৩৩] ভারতে এই তীব্র অপুষ্টির অন্যতম কারণ অশিক্ষা বা লিঙ্গ বৈষম্য, তবে খাদ্যাভাবই প্রধান।

পৃথিবীর কোনো দেশে খাদ্যভাবের মাত্রা কতটা নির্ণয় করার একটি সূচক আছে যাকে বলা হয় Global Hunger Index বা GHI। খাদ্যাভাবের মাত্রা যত কম হয় এই সূচকের মানও ততই কম হয়। GHI সূচকের মান ২০-এর বেশি হলে ভয়াবহ খাদ্যাভাব চলছে ধরা হয়। ভারতে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১১ সালে GHI সূচকের মাত্রা ২২.৯ থেকে বেড়ে ২৩.৭ হয়েছে।[৩৩] পৃথিবীর আলো-ঝলমল শপিং মলে থরে থরে সাজানো কেক পেষ্ট্রি বার্গার রোল কোক পেপসি। অথচ খোদ আমেরিকায়ই ৩ কোটি মানুষ পেটে ক্ষিদে নিয়ে ঘুমাতে যায়। ফিলিপাইনস্, মেক্সিকো, ব্রাজিল, মরোক্কোয় মানুষ খাবার নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে। ভারতে অপুষ্ট শিশুর মৃতদেহের পাহাড় জমে উঠেছে। হাইতির মানুষ খাবারের অভাবে মাটির বিস্কুট খেয়ে পেটকে ভোলাচ্ছে। এই সন্ত্রাস আমার স্নায়ুতন্ত্র সহ্য করতে পারে না। আমার কলম এলেমেলো হয়ে যায়— "কালি ও চুন কেন ওঠে না গো তাহাদের গালে যারা কেড়ে খায় শিশুর খুন"। বিশ্ব জোড়া নীলচাষ শুরু হয়েছে, এখন বিশ্বজোড়া নীল বিদ্রোহের প্রতীক্ষা।

তথ্যসূত্র :

1. Araghi Farshed: 'The great global enclosure of our time: Peasants and the Agrarion Question at the End of the Twentieth Century', *Hungry for Profit, The Agribusinesss, Threat to Farmers, Food, and the Environment*, ed. Fred Magdoff, John Bellamy Foster, and Frederick H. Buttel, Monthly Review Press, 2000
2. Richharia R.H. & Goveindaswami S : *Rices of India*, Acedemy of Development Seience,1990
3. Deb, Debal: The Economics of Multiple Cropping System: Case Studies from West Bengal', paper presented at the proceeding of the International Workshop on Economics of Ecological Agriculture, Dhaka, SANFEC (8-9 Feb. 2000)
4. Deb, Debal: Industrial vs Ecological Agriculture, Navdenya, RFSTE, New Delhi, 2004
5. Eleventh Five year Plan 2007-2012, vol III . pp-8 Planning Commission, GOI
6. www.unicef.org/india/children-2356.htm
7. aic. ucdavis.edu/oa/Smith. pdf.
8. McMichel Philip: 'Global Food Politics', *Hungry for Profit,The Agribusiness, Threat to Farmers*, Food and the Environment, ed. Fred Megdoff, John Bellamy Foster, and Frederick H. Buttel, Monthly Review Press, 2000
9. Shiva, Bendana, *The Violence of Green Revolution*, Penang, Third World Network, 1991
10. Economic Times, 4.4.2000
11. Monthly Review, July-Aug 1998
12. Mittal Anuradha : 'Third World Treveler, Land loss, Poverty and Hunger', *IFG Bulletin*, 2001, vol-I Issue 3 [www.thirdworldtraveler.com/globalij]
13. George, Susan : *A Fate Worse Than Debt*, Public Interest Research Group
14. Bello Walden & Baviera Mara: 'Food Wars, Agriculture and Food' in *Crisis, Conflict, Resistance and Renewal* : ed. Fred Megdoff and Brian Toker, Monthly Review Press, 2010
15. www.id_fresearch.org/pdf/sps_Agreement
16. Wilkinson John: 'Agriculture and Food' in *Crisis, Conflict, Resistance and Renewal*, ed. Fred Megdoff and Brian Toker, Monthly Review press. 2010
17. Marenho Costa Gioncarlo : 'Global Food Crisis grips Latin America', 25 April 2008 [www.wsws.org/.../food-a25.shtml]
18. Business Standard, 10.10.2000
19. Liberalisation of Agricultural Trade in the WTO Regime : UPDATE Series 5: published by Subhra Mallick, Kolkata
20. Front Line, 2.2.2001
21. শিবা, বন্দনা : 'বিশ্বায়ন ও দুর্ভিক্ষ' : *বিশ্বায়ন ভাবনা ও দুর্ভাবনা*, NBA (P) Ltd.
22. Deb Roy, Bibek : *Beyond Uruguay Round : The Indian perspective of GATT*
23. Querol Daniel : 'Genetic Resource, Our Forgotten Treasure', Third World Network
24. Arora R.K (coordinator, IPGRI Office for South Asia) : 'Ethno Botany: Role in the Conservation and Use of Plant Genetic Resources in India' : Ethnobotany, vol. 9, pp 6-15
25. www.ncap.res.in /.../ pb4.pdf.
26. Ramanna Anathe [www.farmersrights.org/state/country]
27. Sahai Suman [www.genecampaign.org/publication]
28. www.wto.org.
29. www.fsis.usde.gov/.../haccp-8.pdf
30. www.fao.org/docrap/x 5036e/X5036 Ele.htm.
31. Tokar Brian : 'Biofuels and the Global Food Crisis', *Agriculture and Food in Crisis, Conflict, Resistance and Renewal*, ed. Fred Megdoff amd Brian Tokar, Monthly Review Press, 2010
32. Patnaik, Utsa : 'Origins of Food Crisis in Indian and Developing Countries', Agriculture and Food in Crisis, Conflict, Resistance and Renewal, ed. Fred Megolff and Brian Toker, Monthly Review Press, 2010
33. en.wikipedia.org/wiki/Malnutrition
34. www.unicef.org/India/children-2356.htm

প্রবন্ধ

‘পরিবর্তন’-এর আগে ও পরে

পার্থ সারথি

অনেকেই এটা দেখে অবাক হচ্ছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বহু-প্রতীক্ষিত ‘পরিবর্তন’ সাধিত হবার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন শাসকদের অন্য এক রূপ খোলতাই হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনে বিগত জমানার প্রবল-প্রতাপশালী প্রধান শাসক দলটির যে ক্ষমতামদমত্ততা ও আত্মম্ভরিতার জবাব মানুষ দিয়েছিলেন, নতুন শাসকদের আচার-আচরণে ক্ষমতার সেই একই ছবি যেন ফুটে বেরোচ্ছে। ক্ষমতার আসনে বসা মুখগুলো শুধু বদলে গেছে, বদলায়নি ক্ষমতার ভাষা, বদলায়নি ক্ষমতার সদম্ভ কদর্য অভিব্যক্তি। গত কয়েক মাস ধরে যখন একের পর এক কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে বা ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করছেন, বিভিন্ন জায়গায় দুষ্কৃতিদের হাতে মহিলারা লাঞ্ছিত হচ্ছেন, শাসক দলের কর্মীদের হাতে সাধারণ মানুষ ও বিরোধীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তখন নতুন শাসকরা প্রতিটি ঘটনাকে সাজানো বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন আর সবকিছুর মধ্যে শুধুই সরকার-বিরোধী চক্রান্ত খুঁজে পাচ্ছেন। মনে আছে, বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পরও ঠিক একই সুরে বামফ্রন্টের শাসকরা যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই তার মধ্যে ‘বামফ্রন্ট-বিরোধী চক্রান্ত’ খুঁজতে শুরু করতেন।

নতুন শাসকদের হাবেভাবে মনে হচ্ছে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় এরাজ্যে যেন স্বর্গ নেমে এসেছে, এখানে আর কৃষকদের কোনো সমস্যা থাকতে পারেনা, অভাব-অনটন আর ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে কেউ আত্মহত্যা করতে পারেন না, কোনো নারী লাঞ্ছিত বা ধর্ষিত হতে পারেন না, বিরোধীরা কেউ আক্রান্ত হতেও পারেন না। এমন ঘটনা ঘটছে বলে যারা বলছে, তারা সবাই এই সরকারের বিরোধী, এই জমানায় যে ‘উন্নয়নের বান’ ডেকেছে, তাকে কলঙ্কিত করতেই এসব মিথ্যা রটনা করা হচ্ছে মাত্র। শুধু তাই নয়, হুমকি দেওয়া হচ্ছে এই মিথ্যা-রটনাকারীদের শাস্তি দেওয়া হবে বলেও। মনে পড়ে যায়, ২০০৬ সালের মে মাসে সিঙ্গুরের কৃষকরা যখন টাটার প্রতিনিধি দলকে ঘেরাও করে প্রথম বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, সেদিন সন্ধ্যায় সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক সাংবাদিকদের আলিমুদ্দিনে ডেকে বলেছিলেন, এটা সাজানো ঘটনা। কোনো কৃষক বিক্ষোভ ঘটেনি। যেসব সাংবাদিক এই রটনা করছে, এরপর গ্রামে গেলে কৃষকরা তাদের দাঁত উপড়ে নেবে। ঘটনা হলো, সিঙ্গুরের কৃষকরা কিন্তু সাংবাদিকদের দাঁত উপড়ে নেননি, বরং যারা ক্ষমতায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভুলে যান, তাঁদের অবহেলা করেন, অবজ্ঞা করেন, তাদেরকেই ক্ষমতা থেকে উৎপাটিত করার কাজটা শুরু করেছিলেন।

ক্ষমতার মানবিক মুখ

ক্ষমতা কি মানবিক হতে পারে? পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক পালাবদলের প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটা আরো একবার সামনে উঠে এসেছে। যারা বিগত জমানায় বামফ্রন্টের দমন-নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, এবং বিশেষত তাদের মধ্যে যারা তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারেও কম-বেশি সামিল হয়েছিলেন, তাদের অনেকেই বর্তমান সরকার এবং সরকারি দলের আচার-আচরণে বিরক্ত-ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন তুলছেন, এই পরিবর্তন কি আদৌ কাম্য ছিল? অর্থাৎ যারা বিগত বাম রাজত্বের অবসানে পশ্চিমবঙ্গে একটা গণতান্ত্রিক রাজত্বের সূচনা আশা করেছিলেন, বর্তমান রাজত্ব সে আশা পূরণ না করায় তারা আশাহত হয়েছেন। এদের অনেকেই বিগত জমানার শেষ দিকে কিছু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে প্রধান বিরোধী দল ও বিশেষত তার একমেবাদ্বিতীয়ম নেত্রীর ভূমিকায় কম-বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাদের আচরণ যে এতো দ্রুত বদলে যাবে, তা ভাবতে পারেননি। অতীতেও বামফ্রন্ট রাজত্ব সম্পর্কে একইরকম মোহমুক্তির ঘটনা আমরা ৮০-র দশক থেকে লক্ষ্য করেছি। অনেক পুরানো সিপিআই(এম) কর্মী সেদিন দল ছেড়ে অন্য রাজনীতির খোঁজ করেছিলেন, অনেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরেও এসেছিলেন।

তিন দশক পরে যেন সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে, শুধু চরিত্রগুলো বদলে গেছে। অনেকে অবশ্য এখনো বর্তমান শাসকদের গণতান্ত্রিকতায় এতটুকু ঘাটতি দেখতে পাচ্ছেন না। বামফ্রন্ট আমলেও এমনটাই হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে খিদিরপুরে ডক শ্রমিকদের ওপর গুলি-চালনা বা তারপরই মরিচঝাঁপির ঘটনার পরেও বামফ্রন্টের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি যাদের কাছে নিষ্কলুষ থেকে গিয়েছিল, তাদের বেশিরভাগকেই শেষ পর্যন্ত নন্দীগ্রাম গণহত্যার পক্ষে দাঁড়াতে হয়েছিল। কেউ কেউ অবশ্য বুদ্ধিমানের মতো সময় থাকতে (নন্দীগ্রামের পর) ‘ঘুরে দাঁড়িয়ে’ বামফ্রন্টের নিন্দায় সুর মিলিয়েছিলেন। ক্ষমতার কাছে যাঁরা মানবিকতা আশা করেন, তাঁদের সম্বিত ফেরাতেই যেন ইতিহাস চক্রাকার গতিতে এগিয়ে চলে। প্রতিটি চক্রের শেষে নতুন করে একদল মানুষের মোহমুক্তি ঘটে।

ইতিহাস কিন্তু কাউকে ক্ষমা করে না। আজকের দিনেও যাঁরা বর্তমান শাসকদের পক্ষে ওকালতি করতে এগিয়ে আসছেন, তাঁদেরকেও আরো বহু অপকর্মের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সবে তো প্রত্যুষ, এখনো গোটা দিনটাই পড়ে আছে। অনেকে বলছেন, এত তাড়াতাড়ি নতুন শাসকদের অগণতান্ত্রিক

আচার-আচরণ প্রকাশ করার দরকার কী ছিল? একটু ধীরে-সুস্থে নিজেদের উন্মোচিত করলে ভালো হতো না? আসলে আমরা চাই বা না-চাই ইতিহাসের আপন গতিতেই ক্ষমতায় বসা-মাত্র শাসকদের শাসক হয়ে ওঠার পালা শুরু হয়। ক্ষমতা-কাঠামোর ছাঁচে নতুন শাসকদের রূপান্তর-প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিরোধী অবস্থানে থাকার সময় প্রচলিত ক্ষমতা-কাঠামোর সাথে তাদের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্বাভাবিক নিয়মেই তৈরি হয়, শাসক অবস্থানে পৌঁছনোর পরে সেই কাঠামোর সাথেই খাপ খাইয়ে চলার একপ্রকার বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়।

প্রতিটি রাজনৈতিক পালাবদলে আসলে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে অবস্থানগত পালাবদল ঘটে। বিরোধীরা শাসক হন আর শাসকরা বিরোধী। এতদিনকার বিরোধীরা শাসক হয়ে আগেকার শাসকদের মতোই আচরণ শুরু করে দেন, আর পুরনো শাসকরা বিরোধী অবস্থানে গিয়ে চলতি সরকারের সমালোচনা করতে শুরু করেন। সাধারণ মানুষ প্রবাদ বাক্য আওড়ান, 'যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ'। এদেশে সেই ব্রিটিশ সাহেবদের সময় থেকে ক্ষমতা-হস্তান্তরের এটাই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে চলে আসছে। ক্ষমতা-কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত করে না দেখলে এই 'পরিবর্তন' আশাভঙ্গের কারণ হবে বৈকি!

'ব্যাটনের' হাত-বদল

নজর করার বিষয় হলো, বিরোধী অবস্থানে থাকার সময় যে দল রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে, সেই দল ক্ষমতায় এসে কখনই রাষ্ট্রের জন-বিরোধী অত্যাচারী ডানাগুলো ছেঁটে ফেলে না, সাধারণত সেগুলোকে আরো জোরদারই করে তোলে। ফলে নতুন শাসনে নতুন করে শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার পুনরায় বাড়তে শুরু করে। হয়ত তার রূপে কিছু বদল আসে। কিন্তু অন্তর্বস্তুতে ক্ষমতা-কাঠামোয় বিশেষ বদল আসে না। এরাজ্যের সংসদীয় ব্যবস্থার বিবর্তন অনুধাবন করলে এদেশে ক্ষমতা-কাঠামোর স্বরূপটি বুঝতে সুবিধে হবে।

ব্রিটিশ শাসনের অবসানে সারা ভারতের মতোই এরাজ্যেও কংগ্রেস দলটিই ১৯৪৭-এ ক্ষমতাসীন হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস সেই সময় গান লেখেন, 'মাউন্ট ব্যাটন সাহেব ও, তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গ্যালা গো...।' ব্যাটন মানে শাসনযন্ত্র, যেটা এদেশের শেষ ব্রিটিশ শাসক মাউন্টব্যাটনের হাত থেকে প্রায় অপরিবর্তিত রূপে কংগ্রেসের হাতে চলে এলো। রিলে দৌড়ে যেমন একই ব্যাটন হাত ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য-সীমায় পৌঁছে যায়, খেলোয়াড় বদলে যায় কিন্তু ব্যাটনটা একই থাকে, আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রেও তাই। শাসক পাল্টায় কিন্তু শাসন-যন্ত্রটা একইরকম থেকে যায়, একের পর এক শাসকের হাত ঘুরে ব্যাটন এগিয়ে চলে অভীষ্ট লক্ষ্য-পূরণে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে বৃটিশের হাতে তৈরি যে ব্যাটনটা প্রায় অবিকৃত রূপে কংগ্রেসের হাতে এলো, ১৯৭৭ পরবর্তী অধ্যায়ে কংগ্রেসের হাত থেকে প্রায় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই তা চলে এলো সিপিএম তথা বামফ্রন্টের হাতে, এখন আবার তা হাত ঘুরে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে।

ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকালে দেখা যায়, ভারতের আধুনিক রাষ্ট্র-কাঠামোটি ব্রিটিশ শাসকরা খুব যত্ন সহকারে তৈরি করেছিলেন এই উপমহাদেশে তাদের শাসন বজায় রাখার উপযোগী করে। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এই রাষ্ট্র-কাঠামোয় বিশেষ কোনো পরিবর্তন নিয়ে এলো না। বৃটিশের তৈরি ভারতীয় সেনাবাহিনী যা ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষায় উৎসর্গীকৃত ছিল, রাতারাতি তারাই স্বাধীন ভারতের সেনায় রূপান্তরিত হলো। ব্রিগেডিয়ার জে পি দালভির ভাষায়, "The Indian Army was part and parcel of the imperial forces. The British Indian Army had been kept aloof from politics and had been raised primarily to fulfill an imperial rule... Officers were carefully screened for their loyalty... Some, of course, were beneficiaries under the British rule and has a vested interest in maintaining it. Most of the officers had imbibed western ideas, culture, dress and social habits."[১] যার অর্থ "ভারতীয় সেনাবাহিনী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ, রাজনীতি থেকে দূরে রেখে যাদের মূলত সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণের জন্যই গড়ে-পিঠে তোলা হয়েছিল। অফিসারদের তাদের আনুগত্য অনুযায়ী সযত্নে বাছাই করা হতো। এরা অনেকেই ব্রিটিশ শাসনে উপকৃত হয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবে এই শাসন রক্ষায় তাদের কায়েমি স্বার্থ তৈরী হয়েছিল। তারা পশ্চিমী ধ্যানধারণা, সংস্কৃতি, পোশাক-আশাক ও সামাজিক আদতে অভ্যস্থ ছিলেন।"

বৃটিশের বানানো শাসন-কাঠামোর এই বৈশিষ্ট্যগুলো মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে জওহরলাল নেহরু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতে নতুন এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "... of one thing I am quite sure, that no new order can be built in India so long as the spirit of the ICS (Indian Civil Service) pervades our administration and our public services. Therefore, it seems to me quite essential that the ICS and similar services must disappear completely before we can start real work on a new order."[২] অর্থাৎ, "আমি নিশ্চিত যে, আইসিএস-এর ভাবধারায় যতদিন আমাদের প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারি কাজ চালিত হচ্ছে, ততদিন কোনো নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করতে হলে সবার আগে আমার

কাছে জরুরি মনে হয় আইসিএস জাতীয় পদগুলোকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা।" আরো একটি লেখাতে তিনি বলেছিলেন যে, "If any indigenous government takes the place of the foreign government, and keeps all the vested interests intact, this would not even be the shadow of freedom"[৩], অর্থাৎ বিদেশি সরকারের জায়গায় কোন দেশীয় সরকার ক্ষমতায় এসে যদি সমস্ত কায়েমি স্বার্থগুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখে দেয়, তাহলে তা স্বাধীনতার ছায়ামাত্র হবে না।

কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র-নেতারা বিরোধী পক্ষে থাকার সময় যা বলেন, রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে পেলে তা যে সুবিধামতো ভুলে যান, বলা যায় নেহরু থেকেই সেই ঐতিহ্য শুরু হলো। ক্ষমতা হাতে পেয়ে নেহরু-পরিচালিত সরকার পুরানো রাষ্ট্র-কাঠামোয় কোন বদল আনতে তথা ব্রিটিশ আমলের কায়েমি স্বার্থে কোন আঘাত করতে অস্বীকার করলো। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণার পরেও দীর্ঘ দু'বছর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রইলেন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল বাউচার সাহেব। রাষ্ট্র-ক্ষমতার মূল স্তম্ভ সেনাবাহিনী, তার অধিনায়কত্ব থাকলো বিদেশিদের হাতে, আর আমরা ভারতবাসী স্বাধীনতা পেয়েছি বলে আনন্দে মাতোয়ারা হলাম। পাশাপাশি ব্রিটিশের সেবা করে যারা হাত পাকিয়েছেন, স্বাধীনতার সংগ্রামীদের দমন করে যারা খেতাব পেয়েছে, সেইসব সেনা ও পুলিশ অফিসার আর আইসিএস প্রশাসকরা আগের মতোই সদলবলে ক্ষমতার চূড়োয় বসে রইলেন। শুধু ব্রিটিশের গড়ে তোলা সুবিশাল রাষ্ট্র যন্ত্রটা হস্তান্তরিত হয়ে চলে এলো সাদা সাহেবদের হাত থেকে কালো সাহেবদের হাতে।

ফলে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও আমাদের প্রশাসনে বিলেতি আদব-কায়দা পুরোদমে বজায় রইল। লক্ষ্য করবেন, আজো ওপরতলার মানুষদের 'সাহেব' বলে বা নিদেনপক্ষে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতেই আমাদের দেশের আপামর মানুষ অভ্যস্ত। সাহেবদের শীতের দেশের উপযুক্ত কোট-টাই পরে এদেশের সরকারি অফিসাররা আজো সাহেবিয়ানা বজায় রাখেন। আদালতে জজ সাহেবদের 'মি লর্ড' বা 'স্যার' বলে সন্তুষ্ট করতে গলদ-ঘর্ম হন প্রচণ্ড গরমেও কালো কোট পরে থাকা উকিলবাবুরা। এদেশের ক্ষমতা-কাঠামোয় যারা মূল স্তম্ভ সেই পুলিশ, সেনাবাহিনী, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার চূড়োয় বসে থাকা কর্তাব্যক্তিরা ঔপনিবেশিক আমলের এই আদবকায়দা-সম্বোধনগুলো পছন্দ করেন বলেই না স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও এগুলো টিকে আছে। বিভিন্ন শাসক দলের 'জাতীয়' নেতারা দেশপ্রেম নিয়ে যতো সারগর্ভ বক্তৃতাই দিন না কেন, এদেশের শাসন-কাঠামোটি কিন্তু আজো ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে জারিত হয়েই আছে। আগেকার আইসিএস পদের বিলুপ্তি ঘটালেও আইসিএস-ভাবধারা মুক্ত প্রশাসন যে গড়ে ওঠেনি, তার অজস্র প্রমাণ চোখ মেললেই দেখা যায়।

একটা বড় প্রমাণ, দেশের প্রশাসন থেকে বিচার-ব্যবস্থা সর্বত্র আজো ইংরাজি ভাষার ওপর নির্ভরতা রয়ে গেছে প্রায় সেই ব্রিটিশ আমলের মতোই। ইংরেজি ভাষা গড়গড় করে বলতে-লিখতে না পারলে সাধারণত কোন মানুষকে ভদ্রলোক হিসাবে গণ্য করা হয় না, শিক্ষা, চাকরি বা উন্নতির প্রতিযোগিতায় তার স্থান পিছিয়ে থাকে, উচ্চ-শিক্ষা বা উচ্চ-পদ সাধারণত নাগালের বাইরেই থেকে যায়। এরই পরিণতিতে স্বাধীনতার এতো বছর পরেও ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের ব্যবসা রমরমিয়ে বেড়ে চলেছে। বস্তুত ইংরেজি-শিক্ষা আজো গরিব মানুষকে বঞ্চিত করার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে রয়ে গেছে। আদালতে গরিব মানুষের হয়ে মামলা লড়েন উকিলবাবু, ইংরাজিতে কী যে তারা জজসাহেবকে বলেন, জজসাহেবই বা ইংরাজিতে কী রায় দেন, সাপ-ব্যাঙ তার কিছুই গরিব মানুষটির বোধগম্য হয় না। উকিলবাবু আদালত থেকে বেরিয়ে ভালো-মন্দ যা বোঝান তাই শিরোধার্য করে বাড়ি ফিরতে হয় তাকে। নিরক্ষরতার দেশে খানিক ইংরেজি শেখার দৌলতে কতো রকমের জালিয়াতি আর চালিয়াতি যে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদস্থ ভদ্রলোকরা করে থাকেন, তার ফিরিস্তি দিয়ে বোধকরি শেষ করা যাবে না।

সর্বোপরি বিদেশি সাহেবদের কাছ থেকে যে মারাত্মক উত্তরাধিকারটি আমাদের দেশি সাহেবরা পেয়েছেন তা হলো এদেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের নিচু চোখে দেখা। উপনিবেশবাদী সাহেবরা 'নেটিভ' বলে আমাদের গোটা দেশবাসীকে ঘৃণা করতেন, সেখানে দেশি সাহেবরা এদেশের আম-জনতাকে অতটা ঘৃণা না করলেও অবজ্ঞা ও অনুকম্পার চোখে দেখেন বৈকি। গোরা সাহেবদের মতো এরাও ভাবেন যে, এদেশের সাধারণ মানুষ নির্বোধ, কিছু বোঝে না, এদেরকে যেমন খুশি চালানো যায়, যা খুশি বোঝানো যায়, ইচ্ছে করলে ওদের আমরা ঠকাতে পারি, আবার ভালোও করতে পারি। তাইতো বেশিরভাগ সরকারি অফিসার নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে, বাড়ির কাজে অনায়াসে অধস্তন কর্মচারীদের লাগিয়ে থাকেন, তাদের হুকুম করেন, খারাপ ব্যবহার করেন, অনেকে গালিগালাজও করেন। আবার খুশি হয়ে দু-চার টাকা বখশিসও দিয়ে থাকেন।

দেশের আপামর মানুষ প্রশাসনের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবেন, এই রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ঔপনিবেশিক আমল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে। এই ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিরই প্রতিফলন দেখা যায় সংসদবাদী প্রতিটি দলের রাজনৈতিক অনুশীলনে, যেখানে সরকারি ক্ষমতায় গিয়ে অনুদান ও অনুগ্রহ বিতরণ মুখ্য ভূমিকা নেয়। এমনভাবে বেশিরভাগ সরকারী প্রকল্প রচিত ও পরিচালিত হয়, যাতে তথাকথিত

উন্নয়নের সুফল পেতে হলেও শাসক দলের কৃপাপ্রার্থী হতে হয়। মর্যাদার সাথে সুস্থভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটা যে প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার, সে বিষয়ে গণচেতনা ও গণ-জমায়েত গড়ে তোলার বদলে সংসদীয় দলগুলো মানুষকে জড়ো করতে চায় প্রধানত দল বা নেতার প্রতি আনুগত্য দিয়ে, যে আনুগত্য অর্জনের পেছনে প্রধানত কাজ করে 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি'।

এইভাবে স্বাধীন ভারতে একের পর এক সরকার বদলের সাথে সাথে রাষ্ট্র-যন্ত্রটার হাতবদল হয়ে চলে, কিন্তু মূল রাষ্ট্রীয় চরিত্র তথা সংস্কৃতির বিশেষ হেরফের হয় না। আমলা-পুলিশের বিশাল বাহিনীর ক্ষমতা আগের মতোই থেকে যায়। রাষ্ট্র পরিচালনা তথা প্রশাসনের আসল ক্ষমতা এদের হাতেই থাকে বলে এদের কেউ বিশেষ ঘাঁটান না। খুব বেশি হলে পছন্দের অফিসারকে প্রমোশন দিয়ে মন্ত্রী তার দফতরে সচিব করে নেন। বা পছন্দের পুলিশ অফিসারটিকে উচ্চপদে বরণ করে নেন। গোটা ব্যবস্থার খোল-নলচে বদলের চেষ্টা নেহরু যেমন কথা দিয়েও করেননি, তারপরে আর কেউ সে চেষ্টার ধারে-কাছেও যান নি।

পশ্চিমবঙ্গে 'পরিবর্তন'

পশ্চিমবঙ্গে বহু-প্রত্যাশিত পরিবর্তন যে পূর্বতন ক্ষমতা-কাঠামোয় এতটুকু পরিবর্তন আনবে না, তার আঁচ নির্বাচনের আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে এমন কয়েকজন আইপিএস অফিসারকে বাছাই করলেন, যারা বামফ্রন্ট জমানায় তৃণমূলের কর্মীদের ওপর অত্যাচার করেছেন, এমনকি গুলিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন (যে ঘটনার স্মরণে প্রতি বছর ২১ জুলাই ঘটা করে শহিদ দিবস পালন করা হয়)। জয়লাভের পর সেরকম একজনকে মন্ত্রিত্বের পদেও বসানো হয়েছে। তৃণমূল দলের নেতা-কর্মী এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে শুনেছি। একইভাবে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বস্ত একজন আমলাকেও প্রার্থী করে জিতিয়ে নিয়ে এসে মন্ত্রী করা হয়েছে। এই ভদ্রলোকেরা রাজনীতির ধারে-কাছেও ছিলেন না। তাই যাঁরা এতদিন নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তৃণমূল দলের সৈনিক হিসাবে তাদের কর্তব্য-কর্ম করে গেলেন, তাদের 'বঞ্চিত করে' আগের জমানার পুলিশ-আমলাকে বিধায়ক করা বা মন্ত্রী করার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকের মনেই ধন্দ তৈরি হয়েছে।

কিন্তু মমতা জানতেন তিনি ক্ষমতায় আসছেন, আর প্রশাসন চালাতে গেলে এইসব লোক তার দরকার। বিরোধী নেত্রী থেকে শাসক হিসাবে তার 'উত্তরণে' আইপিএস-আইএএস অফিসার-দের আস্থা অর্জন করা একটু জরুরি ধাপ। নির্বাচনে এদের কয়েকজনকে জিতিয়ে এনে মন্ত্রীত্বের পদে বরণ করার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে বার্তা দেওয়া হলো, নেত্রীর বিশ্বাসভাজন হতে পারলে অন্যদের কপালেও এমএলএ বা মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। আগের জমানায় এই অফিসাররা তার দলের লোকের ওপর অত্যাচার করেছেন, বা দলের কর্মীদের গুলি করে মেরেছেন? তাতে কী, ওটাই তো পুলিশের ধর্ম! বাঘকে যদি বলো ঘাস খাও, তা কী হয়!

সিপিআই(এম) ও অন্য বাম দলগুলোর ক্ষমতায় আসার ইতিহাসও একইরকম। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি অপশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক জুড়ে বহু আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল বাম দলগুলো। আন্দোলনকারী জনগণ ও বামপন্থী কর্মীরা তৎকালে পুলিশ-প্রশাসনের হাতে যৎপরোনাস্তি আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। সলিল চৌধুরী গান লিখলেন, "মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা অধিকার, খর্ব করে যারা লাঠি রাইফেলে, মানব না এ বন্ধনে..."। ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হলেন বহু মানুষ। ১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তাদের মৃত্যুকে পুঁজি করে বাম দলগুলো শ্লোগান দিল, 'বুলেটের জবাব ব্যালটে দিন'। এরপর দু'দুটো যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হলেও তাদের আয়ুষ্কাল স্বল্পস্থায়ী হলো, এবং প্রশাসনে জাঁকিয়ে বসার আগেই অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বাইরের চাপে সরকার ভেঙ্গে গেল। এরপরই পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তাক্ত অধ্যায়টি ঘটে গেল। ১৯৭০-৭২ সালে পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে বামপন্থী ও বিপ্লবী আন্দোলন দমন প্রচেষ্টা কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যকে ক্ষত-বিক্ষত করলো। চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং একাধিক গণ-হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলেন রাজ্যবাসী। ১৯৭২ থেকে '৭৭ কংগ্রেসি জমানায় সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার বিলুপ্ত করে একচ্ছত্র শাসন চালু করা হলো।

১৯৭৭ সালে সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অবসান ঘটানো আর সকল গণ-হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করা ও দোষীদের শাস্তিবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলো বামফ্রন্ট সরকার। একাধিক তদন্ত কমিশনও গঠন করা হলো। কিন্তু কোনো কমিশনের রিপোর্টই দিনের আলো দেখলো না। গণহত্যার নায়কদের শাস্তিবিধানের আশা ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বাম কর্মীরা অবাক হয়ে দেখলেন, যেসব পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসি আমলে নারকীয় অত্যাচারের অভিযোগ ছিল, কোন জাদুমন্ত্রে তারা বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়ে গেলেন। তিরস্কার আর শাস্তির বদলে তাদের কপালে জুটলো একের পর এক প্রমোশনের পুরস্কার।

আসলে রাষ্ট্র-ক্ষমতা পরিচালনায় গূঢ় তত্ত্বটি জ্যোতি বসু বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার আগেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। তারা জানতেন বা জানেন যে, প্রশাসনিক কর্তা-ব্যক্তিদের আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জন ব্যতিরেকে রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। পুলিশ এবং আমলাতন্ত্রকে তাই

ঘাঁটানো চলবে না। এরাই হলো রাষ্ট্রক্ষমতার আসল শক্তি, এদের ব্যবহার করেই শাসন চালাতে হয় ক্ষমতাসীন দল ও নেতাদের। সম্প্রতি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব জি কে পিল্লাই একটি আলোচনাসভায় বলেছেন, "শাসক রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় টিঁকিয়ে রাখতে পুলিশ একটা হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, যা এদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ব্যবহার করে থাকে। সিপিআই(এম), ডিএমকে, এআইডিএমকে বা কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন, সকলেই পুলিশকে একই উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়।"[৪] তিনি যেটা বলেননি তা হলো, পুলিশ অফিসাররাও রাজনৈতিক নেতাদের ব্যবহার করে থাকেন নিজেদের আখের গোছাবার জন্য। ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারের মতন কাজ করেন তাদের অনেকেই। এইভাবে ক্ষমতাসীন দল আর পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চ কর্তাদের মধ্যে দ্রুত একটা অশুভ আঁতাত তৈরি হয়ে যায়, প্রতিবার পালাবদলের পর নতুন শাসকরা সামান্য বিন্যস্ত করে ক্ষমতা-কাঠামোটাকে নিজেদের উপযোগী করে নেয়।

এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুশীলনে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের একটা জটিল পরস্পর-নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোনও দল যখন ক্ষমতার বাইরে থাকে, তখন ক্ষমতাসীন দলের নির্দেশে প্রশাসন সেই দলের ওপর নানারকম অত্যাচার নামিয়ে আনে। বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর মিথ্যা মামলা চাপায়, তাদের গ্রেফতার করে, নানাভাবে হেনস্থা করে, বিরোধীদের মিছিল-মিটিং-জমায়েত ভাঙ্গতে অনেক সময় লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাস চালায়। বিরোধী দল তখন 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের' বিরোধিতায় সোচ্চার হয়। 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের' বিরোধিতায় তারা প্রশাসনের কাছে দরবার করে, আবার প্রশাসনকে হুঁশিয়ারিও দেয়। যে সমস্ত সরকারি অফিসার ক্ষমতাসীন দলের কথায় ওঠাবসা করছেন, শাসক দলের ক্যাডারের মতন আচরণ করছেন, ক্ষমতায় এলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও দেয়। বহু জায়গায় বিরোধী দলের কর্মীরা প্রশাসনের ভয়ে কাজ করতে পারেন না। দলের নেতারা সেই ভয় দূর করে কর্মীদের সক্রিয় করতে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চান। শাসক দলের সাথে বিবাদে-সংঘাতে বিরোধী দল প্রশাসনের নিরপেক্ষতা দাবি করে।

কিন্তু নিরপেক্ষ প্রশাসন সোনার পাথরবাটির মতো অলীক বস্তু হয়েই থেকে যায়। যেই বিরোধী দলটিই ক্ষমতায় আসে, তখন প্রশাসনের সাথে সম্পর্কটা একেবারে বদলে যায়। রাতারাতি প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা ভোল পাল্টে নতুন শাসক দলের সেবক হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লাগেন। প্রশাসনকে যে শাসক দলের স্বার্থ দেখে চলতে হবে, চাকরি-জীবনের শুরুতেই এটা তারা শিখে যান। প্রশাসনের হোমড়া-চোমড়া কর্তারা, সাধারণ মানুষের ওপরে যাদের হম্বি-তম্বির শেষ নেই, দেশের আপামর মানুষের রোজগারের তুলনায় যারা সত্যই 'monumental salary'[৫] বা পর্বতসম বেতন ভোগ করে, তারাই তখন প্রমোশন আর ভালো পোস্টিং পাওয়ার জন্য নতুন শাসকদের সুনজরে পড়তে একে অপরের সাথে আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে।

শাসক দলটিও এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সংগঠন মজবুত করা আর বিরোধী দলকে ঠাণ্ডা করার কাজে পুলিশ-প্রশাসনকে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করে নেয়। পশ্চিমবঙ্গে যেসব পুলিশ অফিসাররা এতদিন সিপিআই(এম) নেতাদের কথায় ওঠাবসা করেছেন, তারাই এখন তৃণমূল নেতাদের তুষ্ট করতে চাইছেন। সাম্প্রতিক পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডে একদিকে পুলিশি অপদার্থতা ঢাকতে মুখ্যমন্ত্রী গোটা ঘটনাটা সাজানো বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন, আর অন্যদিকে শাসক দলকে খুশি করতে কলকাতা পুলিশ কমিশনার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, এই ঘটনা আসলে সরকারকে হেয় করার একটা অপচেষ্টা মাত্র!

কিছুই কি বদলায় না?

তার মানে এই নয় যে, ব্রিটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত এদেশের ক্ষমতা-কাঠামোয় কোনোই পরিবর্তন আসেনি। কালের নিয়মে কোনো কিছুই অপরিবর্তিত থাকে না। পৃথিবীতে চিরন্তন সত্য বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তা হলো পরিবর্তন। মানুষের সমাজে পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলে নিরন্তর, কখনো তা প্রকাশ্য, কখনো অন্তর্লীন, কখনো তা শান্ত মৃদু-মন্দ বাতাসের মতো, কখনো তা বিস্ফোরিত অশান্ত আগ্নেয়গিরির মতো। সমাজের এই পরিবর্তনের প্রতি চোখ বুজে বা নির্লিপ্ত থেকে কোন দেশের রাষ্ট্র বা শাসন-ব্যবস্থা চলতে পারে না। রাষ্ট্র এবং শাসকরা যেমন জনসমাজকে একটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি জনসমাজে বহমান পরিবর্তন রাষ্ট্র ও শাসকদের ওপরেও ছাপ ফেলে, ক্ষমতা-কাঠামোকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করে, নির্ধারিত করে। কোন সমাজ কীরকম শাসন-ব্যবস্থায় থাকবে, বা কেমন শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হবে, তা সেই সমাজের সেই সময়কার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অনেকটাই স্থির করে দেয়। অন্তর্বস্তুতে ক্ষমতা-কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো (সেই ব্রিটিশ আমল থেকে) এক থাকলেও সমাজে গণতন্ত্রীকরণের যে অবিরাম প্রক্রিয়া চলছে, তাকে অবজ্ঞা করে শাসন-তন্ত্র চলতে পারে না। সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা অধিকারবোধকে একটা পরিমাণে মর্যাদা দিতে হয় শাসকদের, না দিতে পারলে একটা সময় তাদের সরে যেতে হয়।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল কয়েক দশক-ব্যাপী সুদীর্ঘ আন্দোলনের পটভূমিতে। যে আন্দোলনের প্রধান দাবি-গুলো ছিল আমূল ভূমিসংস্কার, সর্বস্তরে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, পুলিশ-গুন্ডা রাজের অবসান প্রভৃতি। ফলে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারকে কিছু গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতে

হয়েছিল, যা সারা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া, অপারেশন বর্গা চালু করা, উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন মারফত গ্রামাঞ্চলে 'আঞ্চলিক স্বশাসন' কর্মসূচি রূপায়ণ শুরুতে বামফ্রন্ট সরকারকে একটা পরিমাণে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল (যদিও বেসরকারি শিল্প-শ্রমিকদের সংগ্রামের আকাঙক্ষাকে মর্যাদা না দেওয়ায় তাদের সাথে শুরু থেকেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল এই সরকার)। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কার কর্মসূচিগুলো আমূল ভূমি-সংস্কারের বদলে ছিঁটেফোঁটা সংস্কার বিতরণ করে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষকে প্রশাসন ও পার্টির মুখাপেক্ষী করে তোলা আর নিপীড়িত জনসমাজের গভীরে সরকার ও পার্টির জাল বিস্তারের কাজে নিপুণ কুশলতার সাথে ব্যবহৃত হলো। বস্তুত এইসব কর্মসূচির মধ্যে যেটুকু গণতান্ত্রিক অন্তর্বস্তু ছিল তা নিঃশেষে শুষে নিয়ে তৎকালীন প্রধান শাসক দলটি দ্রুত তার দলীয় একাধিপত্য বিস্তারের কাজে নেমে পড়লো। সকল বিরোধী শক্তি এমনকী বামফ্রন্টের ছোট শরিকদের পর্যন্ত অস্তিত্ব নির্মূল করতে বিশেষত গ্রামবাংলায় সুদীর্ঘ সময়কাল জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলো। দলীয় আধিপত্য-নির্ভর এই বিশেষ ক্ষমতা-কাঠামোটি ইতিমধ্যে দলতন্ত্র হিসেবে (কু)খ্যাত হয়েছে।

বর্তমান তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সরকার ক্ষমতায় এলো প্রধানত সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষি-জমি রক্ষার আন্দোলনকে পুঁজি করে, এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরে বিস্তৃত দলতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে বামফ্রন্ট যেমন কিছু সংস্কারমূলক কাজ করে জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিল, এবং নিজেদের দলীয় আধিপত্য বিস্তারে বহুদূর যেতে পেরেছিল, বর্তমান শাসকদের ঝুলিতে তেমন কোন কর্মসূচি আছে বলে মনে হয় না। দলীয় কর্মীদের ওপর এই নতুন শাসকদের না আছে নিয়ন্ত্রণ, না আছে ভরসা। বরং প্রায় সর্বত্র দলীয় কর্মীদের মধ্যে দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে তীব্র সংঘাত এখনই নেতৃত্বের শিরঃপীড়ার কারণ হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই অন্তর্কলহ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তার ওপরেও নেতৃত্বের বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই, থাকবেও না। নিচুতলায় দলীয় সংগঠনই যেখনে নিয়ন্ত্রণে নেই, সেখানে দল দিয়ে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার যে পদ্ধতি বিগত জমানায় চালু ছিল, তা এই শাসকদের পক্ষে বোধকরি ভাবাও সম্ভব নয়।

তাহলে কীভাবে চলবে নতুন ক্ষমতা? বস্তুত আর্থিক বা রাজনৈতিক সংস্কারের ঝুলি বামফ্রন্ট আমলেই ফুরিয়ে এসেছিল, ফলে শেষের দিকে ওই সরকারের সারথিরা শিল্পায়ন আর নগরায়ণের মাধ্যমে উন্নয়নের রথ চালানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাজি ধরেছিলেন রাজ্যে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজি নিয়ে আসার ওপরে। কে না জানে, সেই স্বপ্ন দেখাই তাদের কাল হলো। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকরা তাই রাজ্যে কর্পোরেট পুঁজির আবাহন জারি রেখেও আপাতত প্রধান জোর দিয়েছেন সরকারি অর্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ এবং শিল্প-কারখানা স্থাপন করার ওপরে। পুরনো শাসকদের মতোই এদের ভাবনাটাও হলো, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে পার্টির পেছনে সাধারণ মানুষকে, বিশেষত যুবসমাজকে আকর্ষণ করা। এইভাবে পার্টির ক্ষমতায় টিকে থাকার ভিত সুদৃঢ় করা। লক্ষণীয় হলো, নতুন ক্ষমতা নতুন কোনো শ্লোগান বা কর্মসূচি হাজির করতে পারছে না, একটু পাল্টে নিয়ে পুরনো কর্মসূচিকেই আরো মানবিকতার সাথে কার্যকর করার কথা বলছে মাত্র। কিন্তু সংকট-জর্জরিত এই রাজ্যে ক্ষমতার অনুশীলন কতটা মানবিক হতে পারে?

দেখা যাচ্ছে যে, দলীয় লোকজনের ওপর ভরসা না থাকায় (এবং এখনো বহু পঞ্চায়েত বিরোধীদের হাতে থাকায়) সরকারি কর্মসূচী রূপায়ণে তৃণমূল নেত্রী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আমলাদের ওপরে বেশি ভরসা করতে শুরু করেছেন। গোটা পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে ডিঙ্গিয়ে বিডিও-এসডিও-জেলাশাসকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন। নিজে জেলায় জেলায় আমলাদের সাথে বৈঠক করে নতুন পরিকল্পনা করছেন, পুরানো কাজের হিসাব নিচ্ছেন। তৃণমূল নেত্রী জানেন, তিনি আমলাদের তবু খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, কাজ ঠিকমতো না হলে তাদের কাছ থেকে জবাব চাইতে পারবেন, কাজের অযোগ্য মনে হলে তাদের বদলি করে পছন্দমতো অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু পার্টি সংগঠনে খারাপ লোক নিয়েই তাকে চলতে হবে, সেখানে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে, পার্টি নেতাদের হাতে উন্নয়নের টাকা দিলে তার সিংহভাগই মাঝপথে উধাও হয়ে যাবে। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ ক্ষমতায়ন এসব 'গণতান্ত্রিক' গল্প আপাতত শিকেয় তোলা থাক, জয় হোক আমলা-পুঁজি আর আমলা-শাসনের।

অন্যদিকে সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচির টাকা যেহেতু প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসে (রাজ্য সরকারের তো ভাঁড়ে মা ভবানী) তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থনের বিনিময়ে যতো বেশি সম্ভব সরকারি অর্থ এই রাজ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এইভাবে একদিকে রাজ্যের আমলা-পুলিশ আর অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল উন্নয়ন কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়ার ফলে কিছু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাও চলে আসছে। নতুন সরকার প্রথম যে প্রশ্নে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের দায়ে পড়লো, তা হলো জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে। বন্দীমুক্তির জন্য যে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল, তিন মাসের মধ্যে তার সমস্ত মামলা পর্যালোচনা করার কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত জঙ্গলমহল থেকে না হটলো যৌথবাহিনী, না হলো বন্দীমুক্তি, না উঠলো অসংখ্য মামলা। দু'জন মাওবাদী বন্দীর মুক্তির কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজ মুখে

ঘোষণা করেও পিছিয়ে এলেন।

আসলে রাজ্যের অন্যান্য সমস্যার মতোই মাওবাদী সমস্যাটি মোকাবিলা করতেও সরকার যতটা না আলাপ-আলোচনায় আগ্রহী, তার থেকে অনেক বেশি নির্ভরশীল কেন্দ্রের সাহায্য আর রাজ্যের পুলিশ-কর্তাদের ওপর। ফলে শেষ পর্যন্ত মানবিক মুখ বিসর্জন দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী দিয়েই জঙ্গলমহলে শান্তি ফেরাতে চাইল নতুন সরকার। নতুন করে গ্রামে গ্রামে ঘেরাও-দমন অভিযান, মিথ্যা-মামলায় গ্রেফতার আর সংঘর্ষে মৃত্যুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো, যা নির্বাচনের আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। একদিকে উন্নয়ন আর সরকারি চাকরির টোপ দিয়ে রাষ্ট্র তথা শাসক দলের প্রতি আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা চলছে। আর অন্যদিকে নতুন শাসক দলের মোটরসাইকেল বাহিনী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মানুষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

বস্তুত, অনেকটা পুরানো আমলের মতোই দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে প্রধান শাসকদলের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে সেটা যতটা না নতুন শাসকদের দাপটে হয়েছে, তার থেকে বেশি হয়েছে মনে হয় পুরানো শাসকদের নিজেদের অস্তিত্বের সংকট এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোনো রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতির কারণে। আগের জমানায় প্রধান শাসকদলটি সরকারি ক্ষমতার ওপর চূড়ান্ত মাত্রায় নির্ভর করে দলীয় সংগঠনের যে বিপুল বিস্তার ঘটিয়েছিল, ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ায় সেই সংগঠনের পায়ের তলা থেকে হঠাৎই যেন মাটি সরে গেছে, দোর্দণ্ডপ্রতাপ দলটির অস্তিত্বের ভিত্তিটাই যেন হাওয়া হয়ে গেছে, ফলে তাদের কর্মীদের মনোবল তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

তবে নতুন শাসক দলটি নিচুতলা যেহেতু বহু কেন্দ্রে বিভাজিত, তাই এই মুহূর্তে বহু এলাকা আগের জমানার মতো বিরোধীশূন্য হলেও শাসক দলের বজ্র-আঁটুনি শাসন সেখানে নেই বলেই মনে হয়। উল্টে এই শাসনের মধ্যে ফাঁকফোকর রয়েছে বিস্তর। সাম্প্রতিক অতীতে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে তিনরকম পরিস্থিতি নজরে এসেছে। বাঁকুড়ার হীরবাঁধ ব্লকে দেখেছি, সিপিআই(এম)-এর সংগঠন আগের মতই কাজ করছে। আদিবাসী ও দলিত অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে সন্ত্রাসের কোনও চিহ্ন নজরে পড়েনি। বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকে মনে হলে যেন বিশেষ ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ছাড়াই পুরনো শাসক দলটি ভোজবাজির মতো উবে গেছে আর নতুন শাসকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বীরভূমের নানুর ব্লকে চেহারাটা অন্যরকম। হিংসা-বিধ্বস্ত এই ব্লকে নির্বাচনের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবং তার পেছনে সন্ত্রাসের একটা বড়ো ভূমিকা আছে বলেই মনে হলো। নতুন জমানায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় কিছু সিপিআই(এম) সমর্থক এখানে ঘরছাড়া হয়েছেন। কিন্তু কোথাওই বামফ্রন্ট আমলের সেই খবরদারি নজরদারি খুব আছে বলে মনে হলো না।

উপসংহার

সংক্ষেপে বলা যায়, ক্ষমতা আর মানবিকতার মধ্যে সম্পর্ক সাধারণত বিপরীত অনুপাতে ওঠানামা করে। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের ক্ষমতা যেমন বাড়ে, তার সাথে খানিকটা সঙ্গতি রেখেই তার বা তাদের মানবিক মুখ হারিয়ে যায়, একটা আধিপত্যবাদী শক্তি হিসাবে ক্ষমতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আমাদের পরিবার, সমাজ ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্র ক্ষমতাসীনদের দাপটের পেছনে একপ্রকার সামাজিক স্বীকৃতি বা অনুমোদন কাজ করে। 'এমনটাই তো হয়েই থাকে' বলে শুধু শাসকরাই নন, জনসাধারণও ক্ষমতাধরদের জুলুমবাজি, অন্যায়-অবিচার বেশিরভাগ সময় মেনে নেন বা মেনে নিতে বাধ্য হন। পাড়ার 'দাদারা' জোর করে চাঁদার বিল কেটে দিয়ে গেলে আমরা ক'জন তার প্রতিবাদ করি? ঠিক একইভাবে পুলিশ প্রকাশ্য রাস্তায় হাত বাড়িয়ে ঘুষ নিচ্ছে, বা থানা লক-আপে কাউকে ধরে পেটাচ্ছে, এসব দেখতে-শুনতে আমরা নিতান্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ক্ষমতার অমানবিক আচরণকে প্রশ্ন করার মানুষ খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়।

আমাদের সমাজে-সংস্কৃতিতে ক্ষমতাধরদের অমানবিক আচরণ শুধু প্রশ্রয় পায় তাই না, তা অনেক সময় বিনোদনের সামগ্রীতেও পরিণত হয়। যেমন কিনা রূপালি পর্দার হিরোরা সৎ পুলিশ অফিসার সেজে যখন থানা লক-আপে 'অপরাধী'কে বেধড়ক পেটান বা এনকাউন্টারের নামে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেন, দর্শকরা তার তারিফ করে থাকেন। সমাজ যদি শক্তিমান ক্ষমতাধরদের ক্ষমতা-প্রদর্শনকে সম্মতি দেয়, অনুমোদন দেয়, তবে শাসকরা তার সুযোগ নেবেন এ আর বড়ো কথা কী?

ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একবার আসীন হলে কোন ব্যক্তির যে ভাষা বদলে যায়, কথার সুর বদলে যায়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। একদিকে নেতা-মন্ত্রীরা আর্ত-পীড়িতদের পাশে দাঁড়িয়ে (এরাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতাল পরিদর্শন করে বা আমরি-কাণ্ডে সারাদিন রাস্তায় থেকে যা করলেন) এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সরকারি টাকা ও চাকরি বিতরণ করে যেমন ক্ষমতার মানবিক মুখ তুলে ধরতে চান, পাশাপাশি সেই শাসকই আবার আন্দোলনকারী জনগণ বা বিরোধী শক্তিকে ধমক দেন, পুলিশ দিয়ে তাদের দমন করতে এতটুকু দ্বিধা করেন না। বলেন, শাসক হিসাবে আমি কিন্তু ভীষণ কঠোর। এই দুটোর মধ্যে বিশেষ বৈপরীত্য দেখেন না এদেশের আম-জনতা। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত কঠোর শাসনের পক্ষে সাধারণভাবে একটা সম্মতি গড়ে ওঠে।

সমস্যা হলো, যারা বর্তমান ক্ষমতা-কাঠানোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে একটা বিকল্প শাসন-কাঠামো প্রবর্তনের জন্য

সংগ্রামের কথা বলে থাকেন, তারাও যে সমাজ-চলতি এই ক্ষমতা-সংস্কৃতির প্রভাব থেকে খুব মুক্ত তা মনে হয় না। ক্ষমতাসীন শাসকরা যেভাবে সমস্ত বিরোধিতা ও সমালোচনাকে নস্যাৎ করে দেন, বিরোধী মানুষজনকে সরকার-বিরোধী চক্রান্তের দায়ে দোষী করে থাকেন, বিপ্লবীরাও তেমনি তাদের বিরোধী যে কোন সমালোচনাকে বিপ্লব-বিরোধী চক্রান্ত হিসাবে আক্রমণ করেন, নস্যাৎ করে দেন। শাসক দলগুলোর প্রভাবাধীন এলাকায় যেমন ঘটে, তাদের প্রভাবধীন এলাকাতেও অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজকর্ম চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিরোধিতা ও সমালোচনার প্রতি একইরকম সহনশীলতার অভাব শাসক থেকে বিপ্লবী সকল শিবিরেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায়। বহুস্বর বহুমত বিবর্জিত যে বিকল্প ব্যবস্থার কথা তথাকথিত বিপ্লবীরা বলে থাকেন, আজকের দিনে সাধারণ মানুষের আকাঙক্ষা বা সংগ্রামের সাথে তা এতটুকু খাপ খায় না।

শাসনক্ষমতা থেকে জনতার বিচ্ছিন্নতা দূর করে ক্ষমতাকে আরো মানবিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য ক্ষমতা-কাঠামোয় জনগণের অংশগ্রহণের দাওয়াই বহুকাল আগেই ভারত তথা দুনিয়ার কর্তা-ব্যক্তিরা ভেবেছেন। পঞ্চায়েত, গ্রাম-সংসদ, গ্রামোন্নয়ন কমিটি প্রভৃতি প্রবর্তন এবং সবচেয়ে দরিদ্র-নিপীড়িতদের জন্য সেখানে আসন-সংরক্ষণ ইত্যাদি একগুচ্ছ প্রশাসনিক সংস্কার সেই লক্ষ্যেই কার্যকর করা হয়েছে। কিন্তু কোনোকিছুই মুষ্টিমেয়র মুষ্টি থেকে ক্ষমতাকে মুক্ত করতে খুব সহায়ক হয়নি। কিন্তু এটাও সত্য যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ঠিক আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে, এটা বলা যাবে না। ১৯৭০ দশকের গোড়ায় (বিশেষত গ্রামাঞ্চলে) রাজনৈতিক ক্ষমতার যে বিন্যাস ছিল, আজো সেইরকম আছে, এটা বললে সত্যের অপলাপ হবে। বিগত কয়েক দশকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে নিম্ন-বর্গের সম্পর্ক অনেক নিবিড় হয়েছে, জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে ক্ষমতার সাথে নানাভাবে জড়িয়ে নিয়ে ক্ষমতা নিজেকে পুনর্নবীকরণ করেছে। ক্ষমতার রাজনীতির সাথে জনতার রাজনীতির পরস্পর-সংলগ্নতা ও পরস্পর-বিরোধিতা এই রাজ্যের রাজনীতিকে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করেছে, বর্ণময় করেছে। নতুন জমানায় এই বৈশিষ্ট্যটি কীভাবে রূপান্তরিত হয়, তা আগামী দিনে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে বলেই মনে হয়।

এমন তো হয়েই থাকে

১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিআই(এম) দল তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে লিখেছিল, তারা সরকার তৈরি করলে পুলিশ ব্যারাকে বসে থাকবে, সাধারণ মানুষের কোনো আন্দোলন তাদের পাঠানো হবে না। ক্ষমতায় যাবার পর ওই বছরই যখন দার্জিলিং জেলায় ওই দলের জেলা-নেতৃত্বের পরিচালনায় কৃষক সভার সদস্যরা জোতদার-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন, তখন কৃষকদের দমন করতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশ গুলি চালায়, যে ঘটনায় সাতজন কৃষক রমণীসহ এগারোজন কৃষক শহিদ হন। এভাবেই এরাজ্যে বামপন্থীদের রাজ্যাভিষেক শুরু হয়। শুরুতে পার্টি-পরিচালিত গণশক্তি পত্রিকায় এই ঘটনার নিন্দা করা হলেও, অচিরেই এই ঘটনার পেছনে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র হাতে খুঁজে পায় পার্টি। ক্ষমতায় টিঁকে থাকার স্বার্থে কৃষক আন্দোলনকে 'সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত' বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেন না দলের নেতৃত্ব।

একইভাবে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্টের প্রধান শাসক দল সিপিআই(এম) প্রতিটি আন্দোলন বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের পেছনে শাসক শ্রেণীর তথা সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত খুঁজেছে এবং সেসব দমন করতে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের পাশাপাশি সাধারণ গরিব মানুষের একাংশকে লেলিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস-এর সুদীর্ঘ অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে বামফ্রন্ট-বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনের পেছনে কংগ্রেসের চক্রান্ত দেখাতে চেয়েছে ঠিক যেভাবে আজকের শাসকেরা প্রতিটি ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে তার পেছনে সিপিআই(এম) দলের হাত দেখতে পাচ্ছে।

সর্বোপরি মিলিয়ে নেওয়া দরকার লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি আগের শাসকদের মনোভাবের সঙ্গে বর্তমান শাসকদের মনোভাবের সাযুজ্য। ১৯৮০-র দশকে পুলিশ লক-আপে একজন মহিলা ধর্ষিত হলে বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাইটার্সের সাংবাদিকদের বলেন, এমন তো হয়েই থাকে। এই বিখ্যাত উক্তিটি তথাকথিত রেকর্ড-সৃষ্টি-করা মুখ্যমন্ত্রীর সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের রেকর্ড হয়ে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। আজকের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে একের পর এক নারী-লাঞ্ছনার ঘটনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, তা নির্যাতিতদের প্রতি পূর্বতন শাসকদের সেই অবজ্ঞার মনোভাবকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ক্ষমতার আসনে বসলেই রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এই যে পরিবর্তন ঘটে, তা সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করেন। তারাও মুচকি হেসে বলেন, এমন তো হয়েই থাকে, আসলে যে যায় লঙ্কায়...।

1. Brigadier J P Dalvi, 'Himalayan Blunder', Thacker and Co., Bombay 1969, page 345.
2. An Autobiography, Jawharlal Nehru, John Lane The Bodkey Head 1936, page 445.
3. Recent Essay and Writings, Jawharlal Nehru, Allahabad Law Journal Press, Allahabad, 1934.
4. 'Parties use cops power', The Times of India, 23 February, 2012.
5. গান্ধীজী ১৯৩০ সালে লর্ড আরউইনকে লেখা এক চিঠিতে প্রশাসনিক কর্তাদের উচ্চ-বেতন সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করেছিলেন। সূত্র : 'India Mortgaged' by T Nagi Reddy, Tarimela Nagi Reddy Memorial Trust, Andhra Pradesh, 1978.

শতবর্ষে স্মরণ

আত্মসচেতনতার ভাষা

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র শতবর্ষে)

সন্দীপ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৪-এ 'পরিচয়' পত্রিকায় কবিতা-প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও বাংলা কবিতার ইতিহাসে কবি হিসেবে তিনি খুব বেশি প্রতিষ্ঠিত নন— অন্তত গণসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর প্রতিষ্ঠার তুলনায়। অথচ অন্ত্য তিরিশ বা চল্লিশের কবিতায় যে-সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যের স্বপ্নদর্শী চিত্রকল্পে কবিতায় আরও তীব্র এক আততি সংযোজিত করতে কাঙ্খিত কবিদের মধ্যে নিজস্ব রূপকল্প ও উচ্চারণে প্রাতিস্বিকতা-স্পর্শী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তিরিশের গরিষ্ঠ সংখ্যক কবিদের অন্বিষ্ট ছিল টেকনিকের এই স্বাতন্ত্র্য-অর্জন। তাঁরা নেরুদার মতো জেনেছিলেন টেকনিকের ইতিহাস কাব্যরূপের অগ্রগতির নেপথ্যে থাকে ক্রিয়াশীল। আর, বিষ্ণু দে, সমর সেন কিংবা অগ্রজের অটল বিশ্বাসে দ্বিধাভারাতুর সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই টেকনিকের উৎসে যেতে চেয়েছিলেন কখনও লোকায়তনিক, কখনও নগরজীবনের ঠাট-ঠমকে আন্দোলিত কখনও পুরাণকল্পে উল্লিখন-উজ্জ্বল ভাষায়, বাক্‌ভঙ্গিতে ও ইওরোপিয় সমকালবর্তী আধুনিকতা থেকে পরিগৃহীত মুখ্যত মঁতাজ, সিটিস্কেপ ও প্রতিষঙ্গ-প্যারাডক্স যোজনায়। অন্ত্য তিরিশ ও চল্লিশের সমকালীনদের মতোই জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর কবিতায় রূপকল্পের স্বাতন্ত্র্য-নির্মাণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-ভাবী সমাজতন্ত্র ও আক্রামক দুর্ভিক্ষ-দলিত সময়ের রেখচিহ্নকে ধরতে উৎকণ্ঠ ছিলেন। বিষ্ণু দে ও সমর সেনের প্রায় সমবয়েসী (১৯১১) হওয়া সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্র কবিতা-প্রকাশে তার অল্প পরবর্তী। মণীন্দ্র রায় লিখছেন, "বাংলায় আধুনিক কবিতা আন্দোলন শুরু হবার পাঁচ সাত বছরের মধ্যেই কবিতা লিখতে শুরু করেন তিনি। এবং অচিরেই তিনি শ্রী বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখের যোগ্য সহযোগী হয়ে ওঠেন।" এলিয়ট-পাউন্ড-র‍্যাঁবো-মালার্মে ব্যবহৃত কাব্য কৌশলের ব্যবহারে তিনি প্রধানত বিষ্ণু দে-র সমস্পর্শী। তবে তাঁর ভিন্ন দিকটি হলো— তিনি স্বয়ং গীতিকার, সুরস্রষ্টা ও ধ্রুপদী মেজাজ ও স্বরক্ষেপণ-সমৃদ্ধ গায়ক হওয়ায় সংগীতের আঙ্গিক বা করণকৌশল খুব সূক্ষ্মভাবে কবিতায় সংযোজিত করেছিলেন। আর এরই সঙ্গে উল্লিখন, প্রতিসঙ্গ, স্থিতি ও উদ্বর্ত (ফিকসিটি ও ফ্লাক্স), দ্বন্দ্ব প্রভৃতি রূপগত করণকৌশল বিষ্ণু দে-সমর সেন-এর সমকালীন-অনুবর্তী রূপেই চিনিয়ে দিতে চায় নিজেকে সেদিনকার পাঠকের কাছে। তাঁর সভা-উতরোল-কবিতা 'মধুবংশীর গলি'র নির্মাণ কৌশলে এলিয়টের অনুষঙ্গ-ব্যবহারের নির্মাণরীতিটি লক্ষণীয়। নামকরণে 'পুনশ্চ' (১৯৩২)-র 'বাঁশি' কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'কিনু গোয়ালার গলি'-র প্রতিধ্বনি। তিনি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলিকে যার ভিতর দিয়ে রোমান্টিকতার হারানো সময় উঠে আসে। সেই জগতের, সময়ের জন্যে তাঁর ভিতরলীন বেদনা মর্মরিত হয়ে উঠল। পাঠক পড়েন :

> হে পঁচিশ নম্বর
> মধুবংশীর গলি,
> তোমাকেই আমি বলি।
> রৌদ্রস্নাত খাটুনির পর সমস্ত দিন
> মেরুদণ্ডহীন
> মানুষগুলিকে সম্মান করে,
> ঘৃণা করে আর হিংসা করে,
> নগ্ন নগণ্য সন্ধ্যাকে পাই
> —তোড়া বাঁধা শ্মশানে পাঠাবার ফুল—
> একটা অন্যায় শৌখিনতায় মন হারায়, কুল,
> ঘ্রাণ নিই প্রাণ ভরে।

নিম্ন-মধ্যবিত্তের ভাঙাচোরা, স্বপ্নলিপ্সু জীবনের সঙ্গে জড়িত এই চিত্রকল্পের কবির তির্যক উচ্চারণ :

> হলদে আকাশ থেকে কার আশীর্বাদ যেন পড়ে।
> ছারপোকার দৈনিক খাদ্য হিসাবে তাই
> খাটিয়ার ওপর বসি, বিড়ি ধরাই
> আর, মনে মনে প্রতিজ্ঞা রোজ করি—
> দোহাই পতিতপাবন হরি,
> আর নয়, আমার লম্পট প্রবৃত্তিগুলিকে,
> দস্যু লোভগুলিকে
> চালান করো আন্দামানে।

'দস্যু লোভগুলিকে' 'আন্দামানে' 'চালান করবার প্রার্থনার মধ্যে একই সঙ্গে আত্মকরুণার থেকে উৎসারিত উক্তি, আর আর-ও বড়ো প্রেক্ষিতে বৃটিশ-উপনিবেশের সচেতন নাগরিকের ঘৃণাময় উচ্চারণও অভিব্যক্ত। বিষ্ণু দে ও সমর সেন-এর সঙ্গে এখানেই তাঁর সামীপ্য-সাদৃশ্য যে, তিনিও চিরলীন সৌন্দর্যের রূপক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার পঙক্তিগুলিকে তাঁর সমকালের রূঢ়, স্ববিরোধী ও ক্লিন্ন সময়ের ভিন্ন-প্রান্তবর্তী সৌন্দর্য বলয় রূপে স্থাপন করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রের উচ্চারণ :

> হে অনবগুণ্ঠিতা
> অকুণ্ঠিতা
> পঁচিশ নম্বর মধুবংশীয় গলি,

তোমায় চুপি চুপি বলি:
আকর্ষণ? অনেক অনেক আছে,
তোমার শীতে ঠাসা
অমাবস্যার বাসা
ইট বের করা দেয়ালের কোণে কোণে!

এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ডের' আয়তি নিশ্চয়ই তাঁর বৈদগ্ধ্যে জেগে ছিল। কিন্তু দীর্ঘতর এই কবিতায় প্রকট ১৯১৭ থেকে 'দ্য হলো মেন' অবধি এলিয়টীয় কাব্যরূপের পুনর্ব্যবহারটিই লক্ষণীয়। জেরনটিয়নের অভিজ্ঞতাকে তাঁর মার্কসপন্থী ইতিহাসবোধের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান, অন্য এক তাৎপর্যে খরতা পায় এই অনুষঙ্গ :

বৃদ্ধযুগের গলিত শবের পাশে
প্রাণকল্লোলে ঐ নবযুগ আসে।

কিন্তু কোনও একমাত্রিক আশাবাদে তাঁর এই উচ্চাভিলাষী কবিতার সমাপ্তি নয়। আত্মসচেতন মননে গরিমায় এসেছে আদি মৌলিক (আর্কেটাইপাল) চিত্রকল্প। বিপ্লবের আশাবাদী ঘোষণায় প্রতিসাম্যে —

আপাতত এখানেই,
একটু আরও কাছে এসে বসো,
দুহাতে নিংড়ে নিয়ে ফাল্গুনের
দ্রাক্ষাকণাগুলি।

এবং তিনি জানেন :

'ধুরন্ধর অতীশেরা ইতিহাস মানে
হলদে রং পাতা হয়ে ঝরে যাবে সব
কালের সন্ততি। (ইতিহাস, সমুদ্র ও প্রেম)।

তিনি যখন লেখেন :

রম্যরচনার মতো তুমি অদ্বিতীয়া
এখানে অজস্র হও লক্ষবার পরিণীতা হয়ে
আমি আছি তোমারই শরীরে,—
চিরশ্যাম অরণ্যের মতো।

তখন আদি-মৌলিক চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে তাঁর রোমান্টিকতা ও ইতিহাসচেতন আধুনিকতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয় অনুভব করা যায়। সমসময়ের বাস্তব, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ, সুররিয়ালিস্ট কবিতা আর অর্জুনের প্রতীকী ব্যবহার স্তর থেকে স্তরান্তরে পাঠকের চেতনা প্রসারে তিনি মগ্ন থাকেন। আবার এলিয়ট যাকে 'Musical Pattern of sound, a musical pattern of the secondary meanings of the words...' বলেন তার প্রতিও তাঁর বৈদগ্ধ্যের, এলিট সচেতনতার এক দাবি থাকে।

হয়তো ধ্রুপদী সংগীতের অনুষঙ্গ থেকে মৌল শিকড় সমৃদ্ধ সংগীতকে কবিতায় সঞ্চারিত করবার উৎকাঙ্ক্ষায় তিনি পরবর্তী সময়ের পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'-এর প্রথম সংখ্যায় 'স্বরান্বিতা' গদ্যে 'ব্যক্তি-চিত্রকল্প থেকে লোক-চিত্রকল্পের সাধারণ্যে উত্তরণ এর আশাটি ব্যক্ত করেছিলেন। যদিও এলিট-অনুসারিতা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের পরিশীলিত ভাষা আবহকেই গ্রহণ করেছে। লোকচিত্রকল্পেও সেই আরোপিত অভ্যাসের ক্লেশস্বেদ থেকে গেছে। তবু জ্যোতিরিন্দ্র 'স্বস্তিবাচন'-এর মতো কবিতায় পুরাণকল্পের বিপ্রতীপে সাম্প্রতিকের স্বপ্নভঙ্গ, ক্ষোভ ও ক্রোধের অন্য মাত্রা যোজনায় নব্যধ্রুপদী মেজাজের যে আবেগকে গ্রহণ করেন সময়ের চাপে তাকেও অগ্রাহ্য করা যায় না—

হে অম্বুজ মাতা!
এইসব মানুষের ক্ষুরধার স্বপ্নের চূড়া
ছিন্নভিন্ন করে যদি অঞ্চল তোমার
ক্ষমা করো সম্বরণ করো অভিশাপ।
আমাদের আরো কত পাপ
স্ফীত নীল শিরায় শিরায়
বিষবর অজগর; সুপ্ত কুণ্ডলিনী
অষ্ট সিদ্ধি, তাই পরাহত।।

তিরিশের এলিয়ট-অনুরক্ত অন্য কবিদের মতো জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতাতেও 'Unreal City'-র 'A crowd flowed over the bridge' সমতুল ছবি জেগে ওঠে :

কুষ্ঠের সারি
অন্ধ, খঞ্জ বধিরেরা গলাগলি।
মৃতবৎসর বৎসেরা জন্মে, মেঘের মতন
হামাগুড়ি দিয়ে দূরে।
অস্ত্রোপচারে, হাসপাতালের জল—
অন্ত্রবিহীন, যন্ত্রণা-কুঞ্চিত
কবন্ধদের সারি।

এরই পাশে :

স্বদেশ প্রেমিক
টেররিস্টদের ঘাড়ে চেপে চেপে
এখানেও বক্তৃতা।

'দ্য হলো মেন'-এর দূরাগত প্রতিধ্বনি শোনা যায় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ কবির উচ্চারণে—

আমাদের ক্লান্ত দেহে
সাড়া নাই প্রারব্ধ পাপের

এভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর মনন গরিমায় আত্মসচেতন কবিতাভাষায় সময়কে গেলেন বাজিয়ে।

অনুষঙ্গ

১. কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র / রাজধানী ও মধুবংশীর গলি / ১৩৮১। (ভূমিকা-লিখন)।
২. দ্য ইউজ অব পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য ইউজ অব ক্রিটিসিজম, ফ্যাবার।

[illegible]

arunodaya1945@yahoo.co.in